ইস্তিরী মাত্রেই

বড়দের হাসির উপন্যাস

শ্রীঅবনী সাহা

ISTIRI MATRAI

(Wives in General)

A HUMOROUS BENGALI NOVEL

By

ABANI SAHA

ইস্তিরী মাত্রেই

(বড়দের হাসির উপন্যাস)

শ্রীঅবনী সাহা

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশ করেছেন :
পি. তিরকদার
১০৩, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :
অরুণ বণিক

বেঁধেছেন :
প্রোগ্রেসিভ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৪৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

ছেপেছেন :
প্রদীপকুমার হাজরা
শ্রীমুদ্রণ
৩৮, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

দক্ষিণা : ছ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

উৎসর্গ

চলচ্চিত্র প্রযোজক

শ্রীশান্তিরঞ্জন সাহার ভগিনী
শ্রীগোরাচাঁদ সাহার ইস্তিরী
শ্রীমতী বীণা (বাদিনী) সাহা

ও

সঙ্গীতশিল্পী শ্রীসুকুমার মিত্র মশায়ের ইস্তিরী
বেতারশিল্পী শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রকে
পরম ভীতির (?) নিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত হলো।

[আহা-হা, এই সেদিনও 'কিছু খাবনা, কিছু খাবনা', বলে দু' প্লেট সন্দেশ (নারকেলেরই বোধ হয়), তিন প্লেট কচুরী সেবড়ে এসেছিগো ! এরপর কি আর ওমুখো হওয়া যাবে ! মানে এই ধর্মগ্রন্থ (?) পাঠের পরে !]

—গ্রন্থকার

॥ এই লেখকের ॥

অমরাবতী ট্রেনিং কলেজ (বড়দের ব্যঙ্গ নাটিকা)

স্বাধীনতা বলেছেন : এমন নাটক বাংলা সাহিত্যে বিরল।

কনে থেকে কনে বউ (উপন্যাস)

আনন্দবাজার বলেছেন···এমন তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল ভাষা-বিন্যাস সচরাচর দেখা যায় না।

বধূ মানেই মধু (রস-রচনা)

দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, লোকসেবক, সচিত্র ভারত, বসুমতী, জনসেবক কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

ধনেশবাবুর গণেশ উল্টানো (ছোটদের হাসির উপন্যাস)

যুগান্তর বলেন···ছোটদের সঙ্গে বড়রাও উপভোগ করতে পারবে।

ভিতরের কথা

'ইস্তিরী মাত্রেই' বড়দের হাসির উপন্যাস। ইস্তিরী মাত্রেই কী, গ্রন্থকার ভরসা করে তা বলতে পারেন নি। উপন্যাসটি লিখে পাণ্ডুলিপিখানা তিনি কয়েকজন বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাকে পড়তে দিয়েছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ঢাকার শ্রীচিত্ত দাস, বর্ধমানের শ্রীকানাই গড়গড়ী, খুলনার শ্রীঅশোক মিত্র, রেনকুণ্ডার শ্রীরেণুকা পাল, কীর্তিনগরের শ্রীসুকৃতি সেন ও পুষ্পাঞ্জলিপুরের শ্রীপুষ্প দাস। প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। কেউ কেউ আবার উত্তর স্নাতক। স্নান না করে নাকি কেউ ভাত খান না। উত্তর মুখো হয়েও না।

তাঁরা নাকি পাণ্ডুলিপি পড়ে গ্রন্থকারকে বলেছেন ,

: আপনি কি খুব দৌড়ুতে পারেন ?

: আজ্ঞে না।

: আপনার পিঠের চামড়া কি গণ্ডারের চেয়ে মজবুত ?

: আজ্ঞে না।

: হুঁ, যদিও আপনার আসল নাম বাঞ্ছারাম বাবু, তবু আমাদের মনে হয় আপনার বেশ কিছুদিন গা-ঢাকা দেওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থকারকে কেন যে তাঁরা গা-ঢাকা দিতে বলেছিলেন, পাওনাদার ঠেকাতে, অথবা পাঠকদের চাহিদা ঠেকাতে তা অবশ্য আমরা জানতে পারিনি। চাঁদা করে পাঠকেরা কিছু পাওনা মিটাবে কিনা, তাও আমাদের অজানা।

এই সব সুপরামর্শেই কিনা জানিনে, গ্রন্থকার দীর্ঘদিন যাবৎ ডুব দিয়েছেন। কাশি হয়েছে, কি কাশীবাসী হয়েছেন কে জানে!

ইতোমধ্যে এই উপন্যাসের নায়িকা শ্রীমতী হিমালয় নির্ঝরিণী অফিসে এসে আমাদের মানহানির ভয় দেখিয়ে গেছেন। রক্তমাংসের নায়িকা নিয়ে যে গ্রন্থকার এমন বিতিকিচ্ছিরী উপন্যাস লিখবেন, তাকি আমরা আগে জানতুম! জানিনে, নায়ক শ্রীমান অশোকস্তম্ভ চন্দ কোনদিন গুণ্ডা নিয়ে এসে হাজির হন (তাঁর নাকি আবার বুকের ছাতি চল্লিশ

ইফি)। কারণ ইস্তিরীদের কাণ্ডকারখানা বলতে যেয়ে, তাদের বিচ্ছিরী স্বামীদের-ও যেভাবে আসামীর কাঠগড়ায় তুলেছেন লেখক, তাতে কিছুই অসম্ভব নয়।

আমরা অবশ্য ইস্তিরীদের ঠেকাতে এই লেখকেরই লেখা **'বধূ মানেই মধু'** নামে একটি বই মজুত রেখেছি। এবং স্বামীরাও যে মোটেই আসামী নয়, এমন কি পুরুষমাত্রেই যে মহাপুরুষ, এমন একটা বই লেখাবার চেষ্টা করছি।

এখন গ্রন্থকারকে নাগালের মধ্যে পেলেই না গালে পুরতে পারি! আপনারা সন্ধান জানলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন।

॥ **প্রকাশক** ॥

অহঙ্কারেরও মৃত্যু ঘটে। ঘটে বৈকি !

কিন্তু এমন করে যে ঘটে, অশোকস্তম্ভ চন্দকে দেখার আগে, তার কাহিনী জানার আগে আমাদের জানা ছিলো না।

আমরা স্তম্ভ দেখেছি। অশোকস্তম্ভও দেখেছি। আপনারাও দেখে থাকবেন। হরবখৎই দেখে থাকবেন। কিন্তু আমাদের এ অশোকস্তম্ভ, সে অশোকস্তম্ভ নয়। সম্রাট অশোকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। না, বিন্দুসারের সঙ্গেও নয়। অবশ্য ব্যঞ্জনার্থে স্তম্ভ কথাটা গুণবাচক রূপে ব্যবহৃত হয় বটে।

এই নামের ঘ্যাঁট জাতীয় ব্যঞ্জনের জন্য এক পাঠিকা ভদ্রমহিলা নামটি বদলে পুলকস্তম্ভ দিতে বলেছিলেন। শ্রীমান অশোকস্তম্ভকে আমি এই সুপ্রস্তাব দিয়েও ছিলাম কিন্তু সব শুনে স্তম্ভ মশাই বললেন ঃ আমাকে নিয়ে বই লিখতে চাও আপত্তি নেই আমার এবং সে অখাদ্য বই বাজারে চলবে না জেনেও বলছি পুলকস্তম্ভ নামে তোমার যতই পুলক জাগুক, আমার নাম অশোকস্তম্ভই থাকবে। সে নাম পাল্টাতে গেলে আমার দাদামশায়ের কাছে যেতে হয়। কিন্তু তা এখনই সম্ভব নয়। কারণ তোমার মত অর্বাচীন লেখকের পাল্লায় পড়ে তাঁর কাছে ছুটতে হবে এই আশঙ্কায়ই সম্ভবত, দশ বছর আগে তিনি স্বর্গে গমন করেছেন।

এ থেকে বুঝতে পারছেন অশোকস্তম্ভ চন্দের নাম আমি অনিবার্য কারণেই পাল্টাতে পারিনি। পাল্টালে তাকে নায়ক হিসাবেও পাল্টাতে হয়। এই বাজারে নায়ক পাল্টানোও সোজা নয়। মনের মতো নায়ক নায়িকা মেলানোও চাট্টিখানি কথা নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক জগৎ সিংহের নাম বদলে যদি হনুমান সিংহ রাখা হতো তাহলে নবাবনন্দিনী আয়েষা, সুন্দরী আয়েষা কি বলতো, 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' !

বিশেষত অশোকস্তম্ভের কাহিনী স্তম্ভিত হওয়ার কাহিনী। সে কাহিনীই কি আমি আগে জানতাম!

অবশ্য সত্যি বলতে কি এই বিপুলা পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানি! এই যে 'মানুষ মরে' বলে একটা বিদঘুটে সিদ্ধান্তের কথা জানা যায়, কিন্তু সবাই কি আর সব মানুষকে জানাজানি করে মরতে দেখে, না শ্মশানযাত্রী হয়!

তবু কী করে জানি মানুষ মরে! না—অটলরামকে পটল তুলতে দেখি, অমুকচন্দ্র অমুকের তমুক হবার কথা শুনি।

অবশ্য মৃত্যু সম্পর্কে ভাল ভাল কথাও জানি আমরা। খবরের কাগজ, বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে আরও বেশী করে জানতে পাই আমরা।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবাজারী মহাশয় মহাপ্রয়াণ করেছেন। দানবীর দয়াশঙ্কর গর্গ স্বর্গারোহণ করেছেন (এমন কি জীবিতাবস্থায় তাঁর দানের খবর না জানলেও দোষ নেই)।

এছাড়া গঙ্গাযাত্রা, সাধনোচিত ধামে গমন, ইহলোক ত্যাগ-থেকে আরম্ভ করে, ব্যাটা মরে হাড় জুড়িয়েছে প্রভৃতি সাধু-চলতি সব রকমের বচন বিন্যাসেই আমরা জানতে পারি। আর এইসব জানা আর শোনা থেকেই আমরা জানাশোনা সিদ্ধান্তে এসে সিদ্ধান্তবাগীশ হই—মানুষ মরে।

অশোকস্তম্ভ চন্দের কাহিনীও এক মরার কাহিনী। তবে সে মরা কবির কথায়ঃ

'এমন চাঁদের আলো
মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান।'

আর সে স্বর্গারোহণ কাহিনী বলতে গেলে অশোকস্তম্ভের প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হয়। একেবারে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন থেকে নয়। অ্যাত ধৈর্যই বা কই পাঠকের। পঞ্চাঙ্ক নাটক দেখার সময় কি আছে আজকের দিনের তেল চালের লাইনে দাঁড়ানো মানুষের।

তাই এ যুগ—একাঙ্কের যুগ। সেই রূপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মাবার কাহিনী থেকে আরম্ভ করে (আমি অবশ্য কাউকে রূপোর চামচের মত একটা বিচ্ছিরী বস্তু মুখে নিয়ে জন্মাতে দেখিনি), বাল্য-লীলা, কৈশোরলীলা দেখার বা দেখাবার অবকাশ কোথায় আমাদের !

সেজন্যই আমি আমার নায়ক পুলকস্তম্ভ—থুড়ি, অশোকস্তম্ভের কলেজ জীবন থেকেই আরম্ভ করছি। এক কথায় লেজ খসার পর থেকেই আর কি। শুনেছি এই জীবনটাই নাকি জীবনের মতো জীবন। উপবন আর উপ-বোন খোঁজার সময়ই বলতে গেলে।

কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে সুনাম ছিলো অশোক চন্দের। অবশ্য সেরা ছাত্র হওয়া এমন কিছু কঠিনও নয়। এক একজন ছাত্রই থাকে তারা সেরা ছাত্র হবার জন্য জন্মায়। জন্মেই সেরা ছাত্র হয়ে ওঠে তারা। আর মজার কথা এই, একই সময়ে একাধিক সেরা ছাত্র জন্মায় না। জন্মালে প্রথম স্থান অধিকার নিয়ে একাধিক প্রার্থী দাঁড়াতো। দাঁড়ালে দুজনকেই বসে পড়তে হতো। সেরা ছাত্র আর হতে হতো না।

অশোকস্তম্ভের কলেজ জীবনেও আমরা দেখেছি ঐ প্রথম স্থানটি অধিকারের জন্য অন্য কেউ প্রার্থী হতো না। অন্যেরা দ্বিতীয় হতো, তৃতীয় চতুর্থ হতো, কিন্তু প্রথম স্থানটি অশোকস্তম্ভের জন্য ছেড়ে দিয়ে আসতো। ফলে, অশোকস্তম্ভ চন্দ প্রতিবারই সেরা ছাত্র হিসেবে সুনাম অর্জন করতো।

এ যুগে সুনামের সঙ্গে অহঙ্কারের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রথমটি এলে দ্বিতীয়টি আপনিই নাকি এসে পড়ে। কাজেই অশোকস্তম্ভের যদি অহঙ্কার এসে অঙ্গীভূত হতো, তাহলে কিছু আশ্চর্য ছিলো না। কিন্তু না, সেরা ছাত্র হওয়ার জন্য অশোকস্তম্ভের কোন অহঙ্কার ছিলো না।

অশোক চন্দ ভাল দাবা খেলতো। তার দাবার প্রতিদ্বন্দ্বী হিমকল্যাণ গোঁসাই ঘাটালে বদলী হবার আগে কতবার যে ঘাট

মেনেছে চন্দের কাছে, সেও আমাদের জানা ব্যাপার। আমাদেরও কতবার বোড়ের চালে কাৎ করেছে, এমন কি দাবাতে তার সঙ্গে মোলাকাত করা যে বিতিকিচ্ছিরী ব্যাপার, একথাও আমাদের অজানা নয়। সুতরাং ভালো দাবাড়ু হিসেবে অশোকস্তম্ভ চন্দের অহঙ্কার করার হেতু ছিলো। কিন্তু না, তা নিয়েও তার কোন অহঙ্কার ছিলো না।

তবু, অশোকস্তম্ভের অহঙ্কার ছিলো। না, তার রূপ যৌবনের জন্য নয়। অহঙ্কার ছিলো পুরুষ বলে। তার ধারণায় পুরুষ মাত্রেই এক একটি হীরের আংটি। আর হীরের আংটি বাঁকা হলেও নাকি তার বস্তুমূল্য কমে না।

অবশ্য ঐ সঙ্গে করুণা করে বলতো, মেয়েদেরও পুরুষ বলতে পারো। তবে তারা কাপুরুষ।

যদিও অশোকস্তম্ভকে নায়ক না করলে আমার এই বই লেখা হয় না, তবু মেয়েদের কাপুরুষ বলতে আমার আপত্তি আছে। আমার ধারণায় হীলতোলা-জুতোওয়ালা মেয়ে মাত্রেই হীল-স্টেশন। অশোকস্তম্ভকে আমি সে কথা জানিয়েও ছিলাম।

অশোকস্তম্ভ গম্ভীর ভাবে বলেছিলো, এর চেয়ে মেয়েদের যদি এক একটি সারের কারখানা বলতে, তা হলে আমার আপত্তি ছিলো না। আমি কারণ জিজ্ঞেস করাতে, চন্দ একটা কাহিনী বলেছিলো। একবার নাকি সে এক সহপাঠিনীর গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলো। সেখানে একটা মাঠের এককোণে খানিকটা জায়গায় বেশ লম্বা লম্বা ঘাস দেখে সেই মহিলাকে তার কারণ জিজ্ঞেস করে। মহিলাটি উত্তর করেন, ওখানে মাটিতে গোবর ছড়ানো ছিলো কিনা, তাই ঐ পাশটায় ঘাসগুলো এত বড় বড়।

অশোকস্তম্ভ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলো—এবার বুঝলাম। মহিলাটি জানতে চেয়েছিলেন—কি বুঝলেন?

অশোকস্তম্ভ উত্তর দিয়েছিলো—আপনাদের মাথার চুল এত লম্বা হয় কেন।

মহিলাটি নাকি তার পরদিনই কলেজ পাল্টে ছিলেন।

কিন্তু অশোকস্তম্ভ চন্দকে নায়ক করে বই লিখবো বলে, তার একথাও আমাকে সহ্য করতে হয়েছিলো। বিশেষত, নায়ক হবার সব রকম গুণই তার ছিলো। কিন্তু অশোকস্তম্ভ চন্দকে নায়ক করে যে কেউ বই লিখবে এটাতো তার জানার কথা নয়, কিংবা জেনেই বোধহয় চেহারাটা খারাপ না করে খাপসুরত করে বসে আছে। খাপখোলা তরবারির মতো কারো হৃদয়ের সিন্দুকে সুড়ুৎ করে ঢুকে যাবার জন্যেই হয়তো।

কিন্তু তা, সুড়ুৎ ফুড়ুতের ব্যাপার নয়। হৃদয়ের লালবাজারে ঢোকার ফুরসুত কোথায় তার! সঙ্গিনীর জন্য সঙ্গীনের খোঁচা খাওয়ার মতলব আর যারই থাকুক, অশোকস্তম্ভ চন্দের ছিলো না।

আর তার ফল হয়েছিলো, পৃথিবীতে নিজেকে ছাড়া সুন্দর দেখতো না সে। না, কাউকে না। গ্রীক পুরাণে নার্শিশাস বলে এক যুবকের কথা আছে, যিনি জলে নিজের ছায়া দেখে তারই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। অন্য কাউকে তাঁর মনে ধরেনি। দিনের পর দিন সেই নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি মারা গেলেন, আর সেখানে ফুটে রইলো একগুচ্ছ কচুরীপানা জাতীয় গাছ। ঠিক তেমনি কস্তুরীমৃগের মতো নিজের গন্ধে নিজেই মাতাল ছিলো অশোকস্তম্ভ চন্দ।

বিশ্ববিদ্যালয় করিডোরের সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব, টেনিস কোর্টের সুঠাম সুন্দর পাঞ্জাবী বাঙালী অ্যাংলো লতাগণ, কেউ তাকে জড়াতে পারেনি। মহীরুহ অশোকস্তম্ভ চন্দ আপন গলায় কাউকে গলগণ্ড হতে দেয়নি। গণ্ডদেশেও নয়।

এক কথায়, অশোকস্তম্ভ মেয়েদের (মেয়েছেলেদেরও) সহ্য করতে পারতো ততক্ষণই যতক্ষণ তার ব্যক্তিস্বার্থে আঘাত না পড়তো। নিজেকে নিয়ে টান না পড়তো। টানাটানি না পড়া পর্যন্ত নির্বিকার

থাকতে বাধতো না তার। এই সময়কার বহুবিধ ঘটনা, অহঙ্কারের ঘটনাই সেগুলো, আমরা জানতাম। অশোকস্তম্ভ চন্দের সহপাঠিনী তরঙ্গিণী চাকল্যনবীশ বিশ বছরের তরঙ্গিণী। কূলে কূলে ভরা তরঙ্গিণী, সঞ্চারিণীও বটেন। তবে লতা নন, উদ্ভিদ্ বিদ্যায় ট্রী বা গাছ না হলেও প্ল্যাণ্ট।

সেরা ছাত্র অশোকস্তম্ভ চন্দকে সর খাওয়াবার জন্যই কিনা কে জানে, একদিন অনুরোধ করে বলেছিলেন: স্তম্ভদা, যদি অনুমতি করেন, তবে একটা কঠিন জিনিস বুঝে আসার জন্য আপনার বাসায় যাই।

—বেশতো, যাবেন। কঠিনকে তরল, চাই কি বায়বীয় পদার্থে পরিণত করে দেবোখন।

স্তম্ভদা অর্থাৎ অশোকস্তম্ভদা উত্তর দিয়েছিলেন।

একথায় তরঙ্গিণী চাকলানবীশের নবীশমন তরঙ্গিত হবারই কথা। যে তরঙ্গিণী চাকলানবীশের একটি তরঙ্গ যে কোন হস্তিসদৃশ অধ্যাপক ছাত্রকে ভাসিয়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট, তিনি কিনা স্তম্ভের উপর নিজেই আছড়ে পড়ছেন। বাড়ীতে একজন অধ্যাপকের কাছে পড়া সত্ত্বেও।

এর পরিণতি স্বরূপ তরঙ্গিণী চাকলানবীশ এলেন অশোকস্তম্ভের বাড়ীতে। একদিন। আরও একদিন। তৃতীয় দিনেই সম্ভবত অসতর্ক মুহূর্তে নিঃশ্বাসটি দীর্ঘ হয়ে পড়েছিল চাকলানবীশ কুমারীর। এমন দীর্ঘহ্রস্ব নিঃশ্বাস তো কত সময়ই পড়ে অনেকের। ডাইরেক্টরী পঞ্জিকায় তার ফলাফল লেখা আছে কিনা তিলতত্ত্বের মত, সে তথ্য জানা নেই আমার। তা নিয়ে বাড়াবাড়িও কেউ করে না। কিন্তু স্তম্ভদের ব্যাপারই আলাদা, নিজেরা জুড়ে বসে থাকবে কিন্তু কাউকে বসতে দেবে না। মরচে পড়তে দেবে না তারা তাদের গায়ে। আমার দেখা দিল্লীর অশোকস্তম্ভ থেকেই এ ধারণা আমার।

কোলকাতার অশোকস্তম্ভ চন্দও দেয়নি। সঙ্গে সঙ্গে অমন যে বাঙালী মনোলোভা তরঙ্গিণী চাকলানবীশ, তাকে চাল কলা দিয়েই

চাকলা পরগণা দেখিয়ে দিয়েছিল চন্দ মশাই। অর্ধচন্দ্র না দিয়েই অবশ্য। এখানে চাকলা পরগণা বলতে দরজার কথাই মানে করেছে অশোকস্তম্ভ চন্দ।

—ওসব দীর্ঘ-নিঃশ্বাস এখানে চলবে না বুঝলেন! ওসব সেন্টিমেন্টের ধার ধারিনে আমি। ধার করতে হয় না আমাকে এখনও। পেরেক ঠুকতে চান তো নরম দেয়াল খুঁজুনগে।

দেখেছো কাণ্ড! তরঙ্গিণী যেন পেরেক ঠুকতেই গেছেন আরকি! আর অশোকস্তম্ভ চন্দ যেন দেয়াল! শেয়ালই বলা যায় এমন লোককে।

সেইজন্যেই তো পরদিন ক্লাশের শেষে বান্ধবীদের বলেছিলেন তরঙ্গিণী চাকলানবীশ ঃ ঐ চন্দটার বাসায় যাসনে কিন্তু কেউ।

—কেন অ্যালসেসিয়ান কুকুর আছে বুঝি ?

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিকেলবেলা ভট্টাচার্য। বেলতলার বিকেলবেলা ভট্টাচার্য।

—আরে ও নিজেই একটা অ্যালসেসিয়ান। না, সেয়ানা শিয়াল একটা। চাকলানবীশ অ্যালসেসিয়ানের সম্মান দিতে চায় না চন্দকে।

—কেন, কেন বল্‌তো ?

সবাই লেমোনেডের সদ্য বোতল ভাঙা মুখের মত ফেনিয়ে উপচে ওঠে।

—আমি গিয়েছিলাম অধ্যাপক ব্যানার্জির একটা নোট আনতে। যেতেই—

—যেতেই কী ?

সান্ত্বনা দাসের অশান্ত জিজ্ঞাসা।

—যেতেই তো, এটা সেটা খেতে অনুরোধ।

—এটা সেটা কী তা বল্? চুমুটুমু খেতে অনুরোধ করেনি তো ? নাকি হাতে চুমু খেতে চাওয়ার অনুমতি চেয়েছে বলে, তুই সেই ইংরেজি হিউমার থেকে বললি, ইজ্‌ মাই মাউথ্‌ ডার্টি ?

সন্তবিবাহিতা সুনীতি চৌধুরীর নীতিবিগর্হিত প্রশ্ন

—কী যে যা তা বলিস্। বাধা দিয়েছিলো চিত্রলেখা চাকী। —জানিস্ এসব কথা বইয়ে ছাপা হলে খারাপ। লেখকেরা গোয়েন্দাদের মতো এইসব কথাই তো খুঁজে বেড়ায়।

তরঙ্গিণী চাকলা বলেছিলো: প্রায়ই ঐ সব আরকি! কিস্তিতে কিস্তিতেই তো এগিয়ে আসে ওরা। মুখর হয়েই তো মুখের কাছাকাছি আসে। তারপর মুখের কাছাকাছি এলে কি আর বাছাবাছি করার সময় থাকে ওদের? আমায় বলে কিনা, আপনার মতো আমি জীবনে এই প্রথম দেখলাম। আপনার অভিব্যক্তি ম্যাডোনার মতো, হাসি মোনালিসার মতো, দেহের গঠন হেলেন অফ্ ট্রয়ের হেলেনের মতো।

—সেকি—বাংলা উপমা দিয়ে বলেনি কিছু? বাংলা অলংকার শাস্ত্রে লোকটার ধারণা আছে বলে ধারণা ছিলো আমার। অর্থালংকার না হোক শব্দালংকার যোগ করতে পারতো।

বলেছিলো উমা চটপটি।

—বলেনি কি আর, বলতে কি আর বাকী রয়েছে কিছু! বাকী রাখতো কি? নগদ বিদায় করারই তো ইচ্ছে ছিল লোকটার। নেহাত আমার মতো নিস্তরঙ্গ সমুদ্র বলেই না তরঙ্গ জাগাতে পারেনি।

সব শুনে দিগ্‌বিজয়া ঝুনঝুনওয়ালা বলেছিলো: ইস্-স্ কি আফসোস কা বাৎ। হামি যদি তুমি হোতেম, তবে সুঁচ হোয়ে ঢুকে ফালকা মাফিক্ ভিতরমে থেকে যেতাম। বাহার হোতাম না, হাঁ।

দিগ্‌বিজয়াও চারদিক চমকে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলেছিলো। বিজয়মানসেই হয়তো।

আমরা অর্থাৎ অশোকস্তম্ভের পরিচিত ছোট খাট আলোকস্তম্ভেরাও কম ভাবিনি এ নিয়ে।

রবি বিষ্ণুপদ নন্দী বললেন : তাই তো, ঘরপোড়া গরুই শুনেছি সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। ছোকরার ঘরটর কোনো সময় পুড়েছিলো কিনা একবার খোঁজ নাও না হে কালীপদ নাজির মিত্র মশাই। ছোকরা দেখছি ছোকরা সমাজকে ডুবালে একেবারে। একেবারে ছেলেমানুষ। মানুষ হবার কোন সম্ভাবনাই দেখছিনে।

বিমলসুগন্ধি চক্রবর্তী বললেন : দিন কেমন যাবে তা নাকি প্রাতঃকাল দেখেই বোঝা যায়। ছোকরার প্রাতঃকাল হতে বহুৎ দেরী। একেবারে নয়, তুকোবারের ছেলেমানুষ।

জয়জগদীশ্বর সাহা বললেন : তুকোবারে শব্দটি প্রচলিত নয়। কিন্তু ছেলেমানুষ কথাটি চলনীয়। চলন বিলের মতোই নাব্য। কিন্তু ছেলেমানুষেরাও লাড্ডু পছন্দ করে। লেডী আর লাড্ডুতে ধ্বনিগত ঐক্য রয়েছে। লেডীদের লাড্ডু ভাবতে আপত্তি হবার কথা নয়। লাড্ডু হলেই দিল্লীর কথা মনে পড়ে। দিল্লীর লাড্ডু সম্পর্কে গুজব আছে, যে খায় সে পস্তায়, যে না খায় সেও পস্তায়। লেডীদের নিয়েও তাই। কাজেই পস্তাতে যদি হয়, তবে লাড্ডু খেয়ে পস্তানোই ভালো।

গোবর্ধন বর্ধন বললেন : ক্ষিতীশবাবু বলেন, গাধারও নাকি ফিউচার প্রস্পেক্ট আছে। কিন্তু ছোকরা সেদিকেও ভাবলো না একবার!

গদাধর গাড়ুই বললেন : গাধার প্রসপেক্ট মানেটা কি হলো গো বর্ধন স্কোয়ারবাবু?

গোবর্ধন বললেন : এক সার্কাস কোম্পানীতে একটা ঘোড়া ও একটা গাধা ছিল। ঘোড়াটি ভাল খেলা দেখাতো বলে তার খুব আদর ছিলো। গাধাটা বুড়ো হয়ে আসছিলো, আগের মতো খেলাও দেখাতে পারতো না; তাই তার ভাগ্যে জুটতো অনাদর, লাঞ্ছনা। একদিন ঘোড়াটি বললো গাধাকে, কেন এখানে থেকে তুই লাথি ঝাঁটা খাচ্ছিস, এর থেকে বনে যেয়ে থাকাও ভালো। গাধাটি

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, শোন তাহলে, গোপন কথাটা তোমার কাছে আর লুকোব না। একদিন রিঙের খেলা প্র্যাকটিশ করতে যেয়ে সার্কাসের মালিকের মেয়ে পড়ে গিয়েছিলো। মালিক তাকে ধমকে বলেছিলেন, ফের যদি পড়বি তবে তোকে ঐ গাধাটার সঙ্গে বিয়ে দেবো জেনে রাখিস। সেই ফিউচার প্রসপেক্টের লোভেই তো এত লাথি ঝাঁটা খেয়েও এই সার্কাসে পড়ে আছি দাদা! একদিন আমার ভাগ্য খুলেও তো যেতে পারে ভাই।

চিত্তবিমোহন দাসবাবু একপাশে বসে সদ্য বিলাত ফেরত হিমকল্যাণ গোঁসাইয়ের সঙ্গে দাবার চাল দিচ্ছিলেন। হারার সম্ভাবনা দেখে টেবিলে এক চাপড় মেরে (তাতেই অবশ্য খেলা ভাঙার পক্ষে যথেষ্ট) বললেন ঃ শোন তাহলে। আমার শ্যালিকা শ্রীমতী কুমকুম সুবেশা দত্ত। যার জন্য ইয়া আটাশ ইঞ্চি বুকের ছাতিওয়ালা বাঙালী ছেলে, ইয়া চাপদাড়ি শোভিত পাঞ্জাবী ছেলে, ইয়া ভুঁড়িওয়ালা মাড়োয়ারী ছেলে—এমন কি চীনা জাপানী ছোকরা পর্যন্ত নাকি ঘুর ঘুর করে ইউনিভারসিটির বারান্দায়, পাশের কফি হাউসে। এমন কি আমার শ্যালিকা শ্রীমতী কুমকুম সুবেশা ঢুকলে সব হাউসই নাকি হাউসফুল যায়। তা সে বসন্ত কেবিনই হোক, আর বাদশাহী পানের দোকানই হোক। এসব অবশ্য আমার শ্যালিকার কাছে শোনা, আমার স্ত্রী পাহাড়ীঝর্ণা ওরফে অনামিকা দাসের সমর্থিত কথা। আমার স্ত্রী বলেন, আধুনিক জগতে মেয়েদের সৌন্দর্য বলতে—যার যত প্যাকাটির মত দেহ তিনি তত সৌন্দর্যময়ী। জ্যামিতি শাস্ত্রে সরল রেখার যে সংজ্ঞা আছে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ বা বেধ নেই তাই নাকি সরল রেখা। বাঙালী মেয়েদের দেখেই নাকি ইউক্লিড্ সাহেব এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। ঐ রেখা সামনের দিকে বেঁকে গেলেই তা বক্ররেখা।

বেতারশিল্পী সুকুমার কুমার বললেন ঃ বেআদবী মাপ করবেন, আপনার স্ত্রী কি ডি. ফিল পাওয়া সম্পর্কে ভাবছেন ?

চিত্তবিমোহন দাস বললেন ঃ স্ত্রীলোক মাত্রেই ডি. ফিল। অবশ্য ডি. ফিলের মানে যদি ডিরেক্টর অফ্ ফেমেলী ম্যাটারস্ ধরা হয়। স্বামীরা ন পয়সা ছ পয়সার শেয়ারহোল্ডার মাত্র। আসল হোল্ড ঐ ডি. ফিলদের। যাক যা বলছিলাম—আমার স্ত্রী বলেন, মেয়েদের মাথায় চুল যার যত ছোট অর্থাৎ ঘোড়ার লেজের মত বাঁধা, তিনি তত আধুনিকা। আধুনিক সৌন্দর্যতত্ত্বে গালে মাংস থাকা মুটকীর লক্ষণ। সেজন্য যার গালে যত কম মাংস তিনি তত সুন্দরী।

সুকুমার কুমার বললেন ঃ একথা একশ'বার সত্য। আফ্রিকায় যেমন অনেক জায়গায় যার ঠোঁট যত মোটা ও বড় সে তত সুন্দরী, সেজন্য তারা ঠোঁটে ভারী আংটা পরে। কোথাও আবার গলা লম্বা করা সৌন্দর্যের লক্ষণ। জিরাফের মত গলা লম্বা করার জন্য তারা গলায় লোহার রিঙ্ পরে। বেশী দূরে যাবার দরকার কি, চীনদেশে একসময় ছোট পা সৌন্দর্যের লক্ষণ বলে গণ্য করা হতো। এখন আপনার শ্যালিকা যদি বাঙালী নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক হয় সেটা আমাদেরই গৌরবের কথা।

চিত্তবিমোহন বললেন ঃ হ্যাঁ, সেদিক থেকে আমার শ্যালিকা সৌন্দর্যতত্ত্বের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। এখন কথা হচ্ছে, অমন যে সুন্দরী শ্যালিকা তাকে অনেক বুঝিয়ে উজান বহালাম।

মনস্তত্ত্বে যে ক্যানালাইজেশন বলে কথা আছে, এক খাত থেকে আর এক খাতে বহিয়ে দেওয়া যাকে বলে, শ্রীমতী শ্যালিকাদেবীর চিন্তা খালের জলকেও তেমনি অশোকস্তম্ভের দিকে প্রবাহিত করালাম।

পাঞ্জাব থেকে বাংলাদেশে মোড় ফেরানো চাট্টিখানেক কথাও নয়। কিন্তু কী হলো!

আমরা গাড়ুই বর্ধনরা বললাম ঃ কি হলো বিমোহন বাবু, কি হলো দাসচিত্ত বাবু?

চিত্তবিমোহন হতাশ কণ্ঠে দাবা গুটোতে গুটোতে বললেন ঃ আর কি হলো! সতেরো দিন নিজের পয়সায় রেস্তোরাঁয় খাইয়ে, তের

দিন সিনেমা দেখানোর পর অন্য দেয়াল দেখিয়ে দিলো ছোকরা। বলেছে নাকি তার হৃদয়জমিন পরকে দিয়ে চাষ করাবে না। ভাগ-চাষীরা নাকি সুযোগ পেলেই ঠকায় মালিকদের। শেষ পর্যন্ত জমিতে মানে হৃদয়-জমিতে আর মালিকের অধিকাব থাকে না। আমার শ্যালিকা কুম্‌কুম সুবেশা এখন পতিত জমিন খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার বুদ্ধিতে হিন্দুস্থানে না এলে নাকি তার অতগুলো পাকিস্তানী জমিন হাতছাড়া হোতো না।

হিমকল্যাণ গোঁসাই বললেন: স্তম্ভ মানে যদি পিলার হয় তবে পিলার ইজ্ দি ফেইল্যুর অফ্ সাকসেস্ কথাটি যে সত্য সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী কুমকুম সুবেশা দত্ত ছাড়াও আবো কয়েকটি তরণী (?) জেটিতে ভিড়তে চেষ্টা কবেছিলো কিন্তু অশোকস্তম্ভ চন্দের আকাশ-ছোঁয়া অহমিকার চরায় ঠেকে অনেক কষ্টে ফিরতে হয়েছে। প্রেম বস্তুটি যতই নিকষিত হেম হোক না কেন, চন্দের বিচারে তা ন্যাকামি। একটি রোগ বিশেষ। সময়মতো বি. সি. জি. না নিলে টি. বি. রোগের মতো পেয়ে বসে। অশোকস্তম্ভেব ধারণা বি. সি. জি. না নিলেও তার প্রতিরোধ ক্ষমতা অপবিসীম।

আমরাও তার এই সব কাণ্ড কারখানা দেখে হতাশই হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। কোনো নেপোর কথা নয় এটা স্বয়ং সম্রাট নেপোলিয়নের কথা। তিনি বলেছিলেন, মূর্খদের ডিক্সনারীতেই নাকি 'অসম্ভব' বলে কথাটি দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে স্পষ্ট বলা যায় নেপোলিয়ন শুধু বীরই ছিলেন না, নারী সম্পর্কেও পণ্ডিত ছিলেন।

কিন্তু তাঁকেও যদি টুথপেস্টের টিউব থেকে আধ ইঞ্চি পেস্ট বের করে দিয়ে বলা হতো, বের করা অংশটুকু টিউবের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে, আল্পস্ পর্বত বিজয়ী নেপোলিয়ন তা পারতেন বলে মনে হয় না।

তবে এ থেকে মনে হয় নেপোলিয়নের সময় টুথপেস্টের ব্যবহার ছিলো না। থাকলে এ-কথা নেপোলিয়ন বলতেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু এই টুথপেস্টের যুগে এটা নিশ্চিন্ত মনে বলা যায়, প্রেমের ব্যাপারে অসম্ভব বলে কিছু নেই। আজকের বাঁদী কালকের সম্রাজ্ঞী হয়ে সিংহাসনে বসলে আর যাই হোক আশ্চর্য বলে মনে হবে না। অবশ্য ইতিহাসের ক্রীতদাস পরবর্তীকালে সম্রাট হয়ে বসেছে। দিল্লীর দাসরাজবংশের সুলতানদের দিকে তাকিয়েও উদাহরণ দেওয়া যায়।

অশোকস্তম্ভ চন্দ মশাই ক্রীতদাস না হয়েও শেষ পর্যন্ত সম্রাট হয়েছিলেন। হৃদয়কে মহাজনেরা রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এমন কি একটি হৃদয় সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া, একটা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার থেকে মোটেই কম নয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অশোকস্তম্ভ চন্দ প্রেমে পড়েছিলো। হ্যাঁ, অসম্ভব হলেও সম্ভব। ভাগ্যিস্ প্রেমের টুথপেস্ট, হৃদয়ের টিউবে ভরতে বলা হয়নি অশোকস্তম্ভ চন্দকে! আরও আশ্চর্য, এ প্রেম রায় বাহাদুর হরিশঙ্কর দেবের একমাত্র মেয়ে মহামনীষা দেব, চিত্রশিল্পী অমরেশ দের কন্যা নৃত্যশিল্পী চম্পাতুলতুল দে'র সঙ্গে নয়। অতি আধুনিকা মিস্ হেলেন মুস্তাফীর প্রেমেও নয়।

ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন বড় বড় যুদ্ধ জয় করে নাম কিনেছিলেন। শোনা যায় এত বড় বীর কিনা বিড়াল দেখে ঘাবড়ে যেতেন! আমাদের অশোকস্তম্ভও সাগর পেরিয়ে শেষে কিনা গোষ্পদে ডুবলো। অথবা আগের সবাই ডোবা মাত্র, আর শ্রীমতী হিমালয় নির্ঝরিণী দত্তই সাগর। বনে যেয়ে বিড়ালরা বনবিড়াল হয়। নির্ঝরিণীরাই তো শেষ পর্যন্ত সাগর হয়। কেউ আটলান্টিকের মতো অশান্ত, কেউ বা প্রশান্ত মহাসাগরের মতো প্রশান্ত।

আর বংশ পরিচয়ের দিক থেকে হিমালয় নির্ঝরিণী হিমালয় থেকে নয় বহরমপুর থেকে ঝর ঝর করে কোলকাতা পর্যন্ত পৌঁছেছেন আই. এ. পাশ করে এসেচেন।

আর চেহারা !

সাগরের মতোই। মহাকবি কালিদাসের লেখনী থমকে যাওয়া চেহারা। তন্বী কিনা সেটা তর্ক সাপেক্ষ, তবে শ্যামা। হ্যাঁ, শ্যামা মাকে হার মানানো চেহারা।

কিন্তু তাতে কিবা আসে যায়। বিমল সুগন্ধি চক্রবর্তী মশাই বলতেন : নিগ্রো তনয়ার মুখে যদি কেউ সর্বকালের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ট্রয়নগরবন্দিনী হেলেনের সৌন্দর্য দেখেন, সেটা তাঁর চোখের কৃতিত্ব। হোমার সাহেবের নায়ক প্যারিসকে ট্রয় নগরী পোড়ার জন্য দায়ী করা হয়। আসল আগুন কিন্তু ছিলো হেলেনের মধ্যেই। আর সেই আগুনে শুধু ট্রয় নগরীই পুড়ে যায় নি, তার অনেক আগে যুবরাজ প্যারিসই পুড়েছিলেন। আমাদের শ্রীমান অশোকস্তম্ভ চন্দ যদি পতঙ্গের মতো রঙ্গে ধায়, তাহলে আপনি আমি দোষ দিতে পারি নে।

বিশেষ করে কবিই যেখানে বলে গেছেন :

'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
কে কোথায ধরা পড়ে কে জানে।'

ধরাই পড়েছিলো অশোকস্তম্ভ চন্দ।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিপরীত মার্গে সাধনার কথা শোনা যায়। সহজ সাধনায় চন্দকে ফাঁদে ফেলা যাবে না বলেই সম্ভবত পঞ্চশরের দেবতা মদন দেব এই চালাকিটা করে রেখেছিলেন।

কেউ আমরা জানি নি। কেউ আমরা ভাবি নি। আশ্চর্য !

মুর্শিদাবাদ যাওয়ার কথা অশোকস্তম্ভ চন্দের। শিয়ালদা থেকে লালগোলা লাইনে যেতে হয়। এক সময় এই মুর্শিদাবাদে গোলাগুলি যথেষ্টই চলেছে। অর্থে লাল, রক্তে লালও হয়েছে। খ্যাতি ও প্রতিপত্তির প্রতি লালায়িত লোকের জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা, নিকৃষ্টতম রাজনীতির ক্ষেত্ররূপে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের নবাবদের সেই মুর্শিদাবাদ।

ভাল কথা। আমরা নবাবীও চাই না কাজেই ও-নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। তবে অশোকস্তম্ভ চন্দ মুর্শিদাবাদ যাচ্ছে। একজন বন্ধু কোথাও গেলে, আমরা বন্ধুরা কেউ না কেউ তাকে 'সি অফ্' করতে যেয়ে থাকি। অশোকস্তম্ভ আমাদের হতাশ করলেও তার বন্ধুত্ব আমরা অস্বীকার করি নি। বিশেষ করে যে বন্ধু যখন তখন এসে, 'দিন তো ভাই পাঁচটা টাকা, কালকেই 'দিয়ে দোব' বলে ছ'মাস ঘোরায় তাদের চেয়ে অশোকস্তম্ভের মতো বেয়াড়া বন্ধু অনেক ভালো। অনেক কম বন্ধুর।

সুতরাং আমরা শিয়ালদা গিয়েছিলাম। আমি আর কালীপদ নাজির মিত্র মশাই। হাওড়া স্টেশন হলেও আমরা যেতাম। অশোকস্তম্ভকে বন্ধু বলে যেখানে স্বীকার করেছি, সেখানে শিয়ালদা, হাওড়ায় পার্থক্য কি? কিন্তু এত যে পার্থক্য ছিলো তা কি তখন জানতাম!

টিকেট কেটে আমরা তো স্তম্ভকে কামরায় তুলে দিলাম।

কালীপদ নাজির মিত্র জানালা দিয়ে কামরায় মুখ গলিয়ে বললেন: ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো ভায়া। একালের ছাত্র তুমি, মুর্শিদাবাদে ভারতীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন পাবে। প্রাচীন কীর্তির সাক্ষাৎ পাবে। তোপখানা গ্রামে জাহানকোষা কামান দেখো। একটা গাছের মধ্যে আটকে আছে। কাটরা মসজিদ আর মুর্শিদকুলীখাঁর কবরটাও দেখতে ভুল করো না। মসজিদে উঠবার সিঁড়ির নিচে নবাবের কবর। শতজনের পদধূলি পড়বে তাঁর কবরের উপর এই নির্দেশ ছিলো নবাব মুর্শিদকুলীর।

আমি বলেছিলাম: আর কাটরা মসজিদ! তামাম ভারতবর্ষে এর গঠন নৈপুণ্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। দিল্লীর জাম-ই-মসজিদ আড়ম্বরে বড়, ঐশ্বর্যে বড়। এমন কি জাম-ই-মসজিদের চারটে দরজার কপাটগুলো প্রতিটির প্রায় একফুট করে বেধ হতে পারে, হতে পারে তিন হাজার লোকের নমাজের জায়গা জাম-ই-মসজিদের চত্বরে

জলের বিরাট চৌবাচ্চাটার আশেপাশে কিন্তু এমন শান্ত, এমন অনাড়ম্বর অথচ এমন গম্ভীর ও অপূর্ব স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শন কোথায় অন্যস্থানে !

তারপর মুর্শিদাবাদের খোসবাগে নবাব সিরাজ আলিবর্দি প্রভৃতির কবরে একফোঁটা চোখের জল ফেলো। হাজার দুয়ারীর গোলক ধাঁধা, আর অস্ত্রাগারটা দেখো হে ছোকরা। যে কামানটা ফেটে বীর মীরমদন আহত হয়েছিলো, যে ছুরিতে সিরাজ নিহত হয়েছিলো সে সব দেখো। তারপর ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো।

ট্রেনের সময় ছিলো বলে, আমরা দুজনেই ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছিলাম। খেয়াল থাকার কথা নয় যাকে বলছি সে নিজেই ইতিহাসের জলাশয়ে একটা হাঁস বিশেষ। গুগলি খাবে কি শামুক খাবে আমাদের চেয়ে তারই বেশীকরে বোঝার কথা।

তবু বরাবরই আমরা জানি এরকম ক্ষেত্রে রেলযাত্রীর চুপ করে থাকারই নিয়ম। আর উপদেশ যা কিছু তা বন্ধুরাই দিয়ে থাকে। 'সি অফ্'কারী বন্ধুদের এটুকু সুবিধে না দিলে কেউ আর 'সি অফ' করতে আসবে না বলেই আমাদের ধারণা। ঠিক যেমন ম্যাজিস্ট্রেট ছেলের বাবাও চিঠিতে ছেলেকে উপদেশ দেন, দেখেশুনে চলো, খাওয়া-দাওয়া সময়মতো করো ইত্যাদি। যেন, পিতার চিঠি পাবার আগে পুত্র দেখে শুনে চলতো না। আসল কথা বাঙালী মাত্রেই নিজেকে ছাড়া সবাইকে উপদেশ দিতে ভালবাসে। বিশেষ করে যদি সেই বাঙালী কাউকে ট্রেনে তুলে দিতে আসে তাহলে তো কথাই নেই।

যাই হোক অশোকস্তম্ভকে উপদেশ দেওয়া শেষ হলো। সান্ত্বনা দেবার জন্য কালীপদ নাজির মিত্র বললেন : হ্যাঁ, ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করো, তোমার জন্য আরও বিস্ময় আমরা জমা করে রাখবো।

তারপর আমার দিকে ফিরে জনান্তিকে বলেছিলেন : একবার ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক না শ্রীমান, তারপর ! এবার এমন

এক ছিনে জোঁক লাগিয়ে দেবো, বাছাধন এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে না করে পার পাবে না। সে নদী পার হবার মতো ব্রডজাম্প দেবার সাধ্যই থাকবে না স্তম্ভের, দেখে নিও। আমরা বলে, কবে লেজ কেটে বসে আছি, আর হতভাগা কিনা অক্ষত লেজ নাড়বে! আবার আমাদের চিত্তবিমোহন দাস বাবুর শ্যালিকাকে কিনা দেয়াল দেখানো! তরঙ্গিণী চাকলানবীশকে নিয়ে কিনা রঙ্গ করা!

কিন্তু তখন কে জানতো অশোকস্তম্ভ আমাদের জন্য এক চরম বিস্ময় সংগ্রহ করে আনবে। হিরণ্যকশিপু না হয়েও আমরা কী করে জানবো সেই স্তম্ভের মধ্য থেকে এমন বিস্ময়কর কিছু বেরুবে!

কামরাটা খালিই ছিলো। মোটামুটি দূরের যাত্রী বলে আমরাই চন্দকে একটা খালি বেঞ্চে শুয়ে পড়তে বলেছিলাম। তারপরে ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগেই আমরা প্ল্যাটফরম্ ত্যাগ করে এসেছিলাম। হাওড়া স্টেশনে আর একটি বন্ধুকে 'সি অফ্' করার তাগিদেই। দুই 'সি অফের' পয়সায় (এই সময় বন্ধুদের কাছে ধার চাইলে ফেরায় না তারা) এক শো' সিনেমা 'সি' করার মানসেই।

এর পরের ঘটনা দুর্ঘটনারই নামান্তর মাত্র।

একখানি খালি বেঞ্চ জুড়ে আয়েশ করে হাত পা ছড়িয়ে তো শুয়ে পড়েছিলো চন্দ মশাই। না, চিৎ হয়ে চাঁদ দেখবার জন্য নয়। গাড়ীতে। হ্যাঁ, শিয়ালদা প্লাটফরমে গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়ই।

কিন্তু তখন কি সে জানতো শ্রীমতী হিমালয় নির্ঝরিণী দত্তের কলেজ তিন চারদিন আগে বন্ধ হলেও সে দিনের সেই লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনেরই প্যাসেঞ্জার হতে হবে তাকে! আর কেই-বা জানতো, ঠিক ঠিক অশোকস্তম্ভ চন্দের কামরাতেই পাকা আমড়া ভক্ষণরত ছোট ভাইকে নিয়ে উঠবেন শ্রীমতী হিমালয় নির্ঝরিণী তাঁর হিমালয় সদৃশ বপু নিয়ে!

ছোট ভাই বা ছোট কাউকে নিয়ে পথ চলা আজকাল যুবতী মেয়েদের মধ্যে একটা রেওয়াজ অবশ্য আছে আমাদের দেশে। ছোট ছেলেরা এক একটা মাদুলী বিশেষ। এই মাদুলী বেঁধেই পথ চলে অনেক যুবতী। কিন্তু দুটো লজেন্সেই যে এই সব ক্ষুদে মাদুলীদের ক্রিয়া বন্ধ করা যায়, এ তথ্য যদি অভিভাবক মশায়গণ অবহিত থাকতেন তাহলে আর এই ভাবের ঘরে চুরি করতেন না। অথবা অবহিত বলেই, ইচ্ছা করে এই লোক-দেখানো বিবেক পরিষ্কারক উপায় তাঁরা অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু সে হচ্ছে অন্য কথা। এর সঙ্গে আমাদের হিমালয়-স্তম্ভের যোগাযোগ নেই।

বর্তমান প্রসঙ্গে বলা যায়, শ্রীমতী হিমালয় নির্ঝরিণী দত্ত বহাল তবিয়তে উঠলেন। হাইপাওয়ার টেলিস্কোপের দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালেন। শ্রীমান অশোকস্তম্ভ চন্দও নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকালেন। দুই দৃষ্টিতে সংঘর্ষ হলো। বিদ্যুৎ বর্ষিত হলো কিন্তু বজ্রপাত হবার আগেই চন্দ জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে পাশ ফিরে শয়ন করলো।

এরপর শ্রীমতী নির্ঝরিণী রিনিঝিনি কাঁকন বাজিয়ে ছিলেন কিনা চন্দের তা মনে নেই। তবে এটা যেন পাশ ফিরে শোওয়া অবস্থায় মনে হয়েছিলো অশোকস্তম্ভের, শ্রীমতী হিমালয়ের দৃষ্টি তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে! ঐ যেমন কপালের উপর কিছুদূরে একটা আঙ্গুল রাখলো কেউ। তারপর চোখ বন্ধ করতে বললো। এখন আঙ্গুল সরিয়ে নিলেও মনে হবে আঙ্গুলটা ঐভাবেই আছে। শুধু কি তাই, মনটা ঐখানেই সন্নিবিষ্ট হবে এবং একটু পরে কপালটা ব্যথা করতে থাকবে। একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া আর কি। হিমালয় পর্বত কালো। হিমালয় নির্ঝরিণীও কালো। সেদিক থেকে নামের ঐতিহ্য বজায় আছে। সত্যিই বাঙালী হয়েও সাঁওতালী মেয়ের গড়ন তার। বাঙালী মেয়ের তুলনায় ডাকাতে চেহারা হিমালয় নির্ঝরিণীর।

সঙ্গে সঙ্গে অশোকস্তম্ভ চন্দের মনে হয়েছিলো, ডাকাত টাকাত নয় তো!

তা যা চেহারাপত্তর—ডাকাত হওয়া আশ্চর্য নয়। আর মেয়ে মাত্রেই তো এক একটি ক্ষুদে ডাকাত।

মেয়েরাই তো প্রাকৃতিক নিয়মে বধূ হয়ে পুরো ডাকাতে পরিণত হয়। যে নৈপুণ্য, যে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এঁরা স্বামী দেবতাদের পকেট ও হৃদয় সাম্রাজ্যের সম্পদ লুণ্ঠন করেন, বড় বড় পুরুষ ডাকাতরাও হার মেনে যায়।

পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে একমাত্র আমাদের দেশে এইসব ডাকাতদের হাতে যে পরিমাণ পকেট লুণ্ঠিত হয় (স্বামী দেবতাদের খুলে রাখা জামার পকেট) তা দিয়ে পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করা যায়। হ্যাঁ, বৈদেশিক সাহায্য না নিয়েও।

আমেরিকার এক নারী ডাকাতের কথা শুনেছিলাম, যিনি স্বামীর কাছ থেকে প্রতি চুম্বনের জন্য মাত্র ত্রিশ ডলার দাবী করতেন। মুক্তিপণ হিসেবেই দাবী করতেন!

অবশ্য সে দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা হয় না। সে দেশে ঘুমের ঘোরে স্বামীর নাক ডাকলে স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনেন স্বামীর বিরুদ্ধে। স্ত্রী, বিছানায় বিড়াল নিয়ে শুলে স্বামী ছোটেন ডিভোর্সের দরখাস্ত নিয়ে।

অশোকস্তম্ভ চন্দ চোখ বুজে এই সবই ভাবছিলো।

এমন সময়, হ্যাঁ ঠিক সেই শুভ বা অশুভ মুহূর্তে গাড়ীটি ছেড়ে দিয়েছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে তূর্যনিনাদ। ডাকাতেরা কাউকে আক্রমণ করার আগে হয়তো এমনই করে থাকে। না, তূর্যনিনাদ নয়, কণ্ঠ-নিনাদ।

—এই—শুনছেন?

আঁৎকেই পাশ ফিরেছিলো অশোকস্তম্ভ চন্দ। এমন কম্বুকণ্ঠে এমন নিনাদ (মেঘনাদই বলতে গেলে) তাকে লক্ষ্য করে কোন

কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হতে পারে ভাবতেই পারেনি চন্দাবৎ সর্দার। কিন্তু সে ছাড়া তো 'শুনছেন' বলার কেউ নেই গাড়ীতে। 'ওগো শুনছো' বলার মতোও কেউ নেই।

মুশকিল হচ্ছে, বাঙালী পুরুষ মাত্রেই ভদ্র। কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর না দিয়ে থাকতে পারে না বাঙালী পুরুষ।

সুতরাং পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে ওজন করেই উত্তর দিয়েছিলো অশোকস্তম্ভ চন্দ ঃ বল।

—বল নয়, বলুন। জায়গাটা একটু ছেড়ে দিতে হবে, আমরা জানালার এই পাশটায় বসবো।

অনুগ্রহ ভিক্ষা নয়, আদেশ। যে আদেশে যুগ যুগ ধরে ভদ্র পুরুষেরা জ্বলন্ত অগ্নিকটাহে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে এক সেকেণ্ড ইতস্ততঃ করে না। যে আদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের গোবেচারা নায়ক নবকুমার অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীকে অনুসরণ করেছিলো।

কিন্তু অশোকস্তম্ভ নবকুমার নয়। গোবেচারা তো নয়ই। আর স্তম্ভেরা ভাঙ্গে কিন্তু মচকায় না!

না মচকিয়েই অবহেলার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলো অশোক চন্দ ঃ হুঁ তা পশ্চিম পাশের বেঞ্চিতে বসলেই হয়। ওপাশেও তো জানালা রয়েছে।

—তা রয়েছে, সুতরাং সে পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। ঐ সঙ্গে বিবেচনার অভাবের জন্য নিন্দাও করছি। দেখছেন না, ঐ জানালায় রদ্দুর।

জবাব দিয়েছিলেন হিমালয় নির্ঝরিণী। ঝরঝরে ভাষায়। কোথাও না থেমে।

কিন্তু অশোকস্তম্ভ হক কথা বলতে প্রাচীনকাল থেকেই খ্যাতি সম্পন্ন।

—তাহলে, মেয়েদের কামরায় গেলে ভাল হয় না কি? সেখানে হয়তো রোদের বদলে বরফ থাকতে পারে।
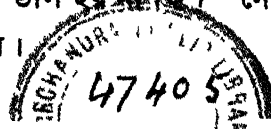
শেষের টুকু অবশ্য মনে মনেই বলেছিলো অশোক চন্দ।

কিন্তু ততোধিক শ্লেষ মিশিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন হিমালয় নির্ঝরিণী : আজ্ঞে এ কামরাটা আপনার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তা জানতাম না।

অ্যাঁ, এবার অশোক চন্দকে ছেড়ে একেবারে তার বাপকে তুলে গালাগাল ! যে সে বাপ নয়, ডাকসাইটে একটা জমিদার বললেই চলে। আজই না হয় জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটেছে কিন্তু তাই বলে কি মরা হাতি লাখটাকায় বিকোয় না !

কোথায় মরা হাতি লাখটাকায় বিক্রী হয় সেটা অবশ্য অশোকস্তম্ভ চন্দ জানে না কিন্তু প্রবাদটা তো আর মিথ্যে মিথ্যে রচিত হয়নি !

আর মরা হাতিই যদি লাখটাকায় বিক্রী হয়, জ্যান্ত-হাতির মত দেহসমৃদ্ধ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিন্দুসারমোহন চন্দ মশাইকে তুলে গালাগাল !

এর ঝাল না তুলে কি শান্তি আছে !

ঝাল তুলতেই বললো চন্দ : দেখুন, নাহয় 'দেখুন'ই বলবো। মেয়েদের বয়সের আবার গাছ পাথর আছে নাকি ? গেছো মেয়েদেরই বয়স ঠিক করা যায় না গাছ পাথরের মতো ! আর মেঘে মেঘে কার কি রকম বেলা হয়েছে তা কি এক বিধাতা পুরুষ ছাড়া কেউ জানতে পারে ! বলি, বিধাতা পুরুষই হিমসিম্ খেয়ে যায় মেয়েদের বয়স ঠিক করতে। তা যাক, কিন্তু তাই বলে বাপ তুলে গালাগাল দেবেন না বলছি।

বেশ একটু ঝাল তোলা গেছে (ধানি লঙ্কার ঝালই বলতে গেলে) ভেবে দৃপ্ত ভঙ্গীতে তাকায় অশোকস্তম্ভ।

—পাগল না হরতুকি। যদিও আমি ওয়েটলিফটিং-এ মেয়েদের মধ্যে এমনকি কয়েকটি ছোকরার মধ্যেও ফার্স্ট হয়েছি, তবু আপনার বাপকে কি তুলতে পারি ! নমস্য তিনি। না-হোক করেও মণ তিনেক ওজন হবে বৈকি ? অবশ্য আপনার মতো হোঁদল চেহারা যদি তাঁর হয়।

দেখেছো! শুনেছো কথা! আগে তো তবু ভদ্র মাফিক ছিলো, এখন কিনা···। সেই যে সেই গুরুশিষ্যের গল্পটা, তার মতোই একেবারে।

এক গুরুদেব এসেছেন শিষ্যবাড়ী। শিষ্য বাড়ী নেই, মাঠে গেছে। শিষ্যের বউ আদর করে জল দিয়েছে পা ধোয়ার। চুল দিয়ে গুরুদেবের পা মুছিয়ে দিয়েছে। পাখা দিয়ে বাতাস করছে। কিন্তু কী আলাপ করবে! গুরুদেবের চকচকে টাকের দিকে তাকিয়ে সম্ভ্রম মিশ্রিত কণ্ঠে বললো: আহা, আমাদের গুরুদেবের মাথাটা যেন পাকা বেলটার মতো।

আর যায় কোথায়! কী—এতবড় কথা! গুরুদেবের এতবড় অপমান! তাঁর মাথাকে বলে কিনা পাকা বেলটার মতো!

এরপর কি আর সেই গুরুদেব সেই শিষ্যবাড়ী থাকেন! তল্পী-তল্পা নিয়ে শিষ্যপত্নীর শত অনুরোধ উপরোধ চোখের জল উপেক্ষা করে গুরুদেব শিষ্যবাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন।

একটু এগুতেই পথে শিষ্যের সঙ্গে দেখা।

শিষ্য তো গুরুর মুখে সব শুনে অনেক করে হাতে পায়ে ধরে গুরুদেবকে আবার বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। এনেই তো বউয়ের উপর 'এই মারি তো সেই মারি' ভাব। বিজাতীয় ভাষায় স্ত্রীকে গালাগাল দিয়ে তার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে বললেন:

—আমার গুরুদেব, তাঁর মাথা ছাগলের মতো হোক, আর মুরগীর আণ্ডার মতো হোক, তোর কী রে, ইয়ে! তুই কেন বলবি পাকা বেলের মতো, অ্যাঁ!

গুরুদেব এতক্ষণ শিষ্যপত্নীর লাঞ্ছনায় মনে মনে বেশ উৎফুল্ল হচ্ছিলেন। শেষ কথাতেই একেবারে বসে পড়লেন। শিষ্যের বউ তবু পাকা বেলের উপর দিয়ে গিয়েছিলো, আর এ ব্যাটা কিনা ছাগলের মাথা, মুরগীর আণ্ডায় ঠেকালে!

হিমালয় নির্ঝরিণীর উত্তরে অশোকস্তম্ভ চন্দের মনের অবস্থা সেরূপই হয়েছিলো কিনা আমরা জানিনে, কিন্তু এটুকু জানি তার মুখে আর কথা যোগায় নি। এরপর কী বা বলতে পারে অশোকস্তম্ভ। একে নারী, তায় মুখরা। অথবা মুখরা বলতে নারীদেরই বোঝায়। এম. এ. ক্লাসের নোট নিতে আসে নি এ মেয়ে যে স্তম্ভদাকে তোয়াজ করবে। আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবার মতো মেয়েও নয় বলেই মনে হয়। তবে!

তবে আর কি? উঠতেই হলো। উঠে জায়গা দিতে হলো। এবং ভাল দিকটাই। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতে হলো ইজ্জৎ বাঁচাতে।

কিন্তু তাতেই কি রেহাই আছে!

—শুনছেন?

'আবার—আবার সেই কামান গর্জন।' বিরক্তিভরে মুখ ফেরাতে হলো অশোকস্তম্ভ চন্দকে।

—কী, বেঞ্চটাও ছাড়তে হবে নাকি?

—না, না অতটা নয়। হাসলেন শ্রীমতী! মিষ্টি দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো হাসি। মেজাজ ভালো থাকলে তক্ষুনি কবিতা লিখতে বসতো অশোকস্তম্ভ চন্দ অমন মুক্তার মতো দাঁতের উপর।

—আমার এই ভাইটির জন্যে একটা আইস্‌ক্রীম কিনে দেবেন?

বাবারে বাবা। আবার ফরমাসের বহরটা ছাখো। নারীরা কি কেবল ফরমাস করবার জন্যই জন্মেছে নাকিরে মশায়! আশোকস্তম্ভের মতে, মেয়েরা যে খবরের কাগজ পড়ে তা কেবল সিনেমা আর গয়নার সংবাদের জন্য। সংবাদ সংগ্রহ করা হয়ে গেলে তাদের ফরমাস করা আর শেষ হয় না নারী জীবনে।

কিন্তু একটি অপরিচিতা মহিলা, না মহিলা কোথায়! কোন মহলের অধিকারিণীর কেউ বলে তো মনে হয় না। মহল্লার চৌকিদার হতে পারে বরং। কিন্তু চৌকিদারই হোক আর দারোগাই হোক

(আজকাল মেয়েরাও তো দারোগা হচ্ছে) অশোকের মতো একটি স্তম্ভকে কিনা ফরমাস !

কিন্তু না শুনে উপায় কি ! নইলে যদি আবার বাপ তোলে !

—আপনার জন্যও একটা কিনতে পারেন ।

হিমালয় নির্ঝরিণী চন্দের দিকে ছুঁড়ে দেন কথাগুলো। মিষ্টি ভাবেই ছুঁড়ে দিয়েছিলেন—ফুল ছুঁড়ে দেওয়ার মতোই।

—আমি আইস্‌ক্রীম খাইনে।

যথাসম্ভব গম্ভীর কণ্ঠ অশোকস্তম্ভ চন্দের ।

—তবে লজেন্স্ খান ! ছেলেরা তো লজেন্সও ভালোবাসে। খেতেও বেশ। যতই চোষ, ততই মিঠে। ততই ঝাল। ততই টক !

নির্ঝরিণী ঝর্ণার মতোই লজেন্সের গুণবর্ণনায় উচ্ছল হয়ে ওঠে। যেন কোনো লজেন্স কোম্পানী তাকেই অর্গানাইজার করে পাঠিয়েছে এখানে। আর অশোকস্তম্ভ চন্দকে লজেন্স গছাতে না পারলে একটা বিরাট কমিশন যেন মারা যেতে বসেছে।

—তা বাসুক। আমি অত ছেলেমানুষ নই।

ইন্‌স্যুরেন্স কোম্পানীর এজেণ্টকে ভাগিয়ে দেবার মতো কণ্ঠ অশোকস্তম্ভের ।

—ও, এম. এ. পড়লে বুঝি ছেলেরা বুড়ো হয়ে যায় !

হিমালয় নির্ঝরিণীর রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যাণ্টের মতো কৌতূহল ।

এবার পরিপূর্ণ ভাবে বিস্মিত হবার পালা অশোকস্তম্ভের। মেয়েটা থট্‌রিডিং জানে নাকি ! নাকি এম. এ. পড়লে তার অভিব্যক্তি চোখে মুখে ফুটে ওঠে ! সদ্যবিবাহিতা মেয়েদের যেমন আহ্লাদে অহংকারে গদগদ অবস্থা ও চপল হাসি দেখে চেনা যায়।

বিবাহিত দম্পতিকে দেখে যেমন চেনা যায় তাদের পথ চলা দেখে। যদি দেখা যায় একজন ভদ্রলোক ও একজন ভদ্রমহিলা পথ চলছেন, পাশাপাশি নয়—একটু দূরে দূরে। অথবা কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও নিস্পৃহভাবে চলছেন, কেউ আগ্রহ নিয়ে কথা

বলছেন না, (কথা তাঁদের ফুরিয়ে গেছে) বুঝতে হবে তাঁরা নির্ঘাত স্বামীস্ত্রী।

অভিমতটা অবশ্য গোবর্ধন বর্ধনের। তিনি নাকি শতকরা নব্বই জোড়া নারীপুরুষকে দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন।

ভ্রূ কুঁচকে একটু বিস্ময় ও চাপা আনন্দ মিশিয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলো চন্দ : আমি যে এম. এ. পড়ছি একথা আপনাকে কে বললে ?

এবার তৃতীয়ার চাঁদের মতো হাসলেন হিমালয় নির্ঝরিণী। হেসেই বললেন : কে আবার ! আপনার পোর্টফোলিও ব্যাগ। ঐ থেকেই নিশ্চিত ভাবে বুঝলাম। বুঝলাম আপনি মন্ত্রী সন্দেহ নেই, তবে দপ্তরবিহীন। এম. এ.। তবে পাশ করে ওঠেন নি এই যা।

ডাকাত। সত্যি ডাকাত মেয়ে বাবা। কথার বাঁধুনি দেখেছো। সাধারণ মসলা দিয়েও যেমন পাকা রাঁধুনিরা চিত্তছোঁয়া রান্না করে। অশোকস্তম্ভের মতো নিরীহ সৎ ছেলে কিনা শেষ পর্যন্ত একটা ডাকাত মেয়ের পাল্লায়ই পড়ে গেলো !

কোলকাতা থেকে বহরমপুর 'যোজন খানেক দূর' নয়। অনেক অনেক মাইল। নৈহাটী স্টেশন ছাড়বার পরই কামরার অবস্থা অন্য রকম। অশোকস্তম্ভ চন্দ লুণ্ঠিত। আর সর্বহারা অশোকস্তম্ভ চন্দ লুণ্ঠনকারীকে কাতরভাবে কী যেন বলছে। সম্ভবত প্রাণভিক্ষাই চাইছে। লুণ্ঠনকারিণীর মুখে বিজয়িনীর হাসি। না, হাতে কোন রিভলবার টিভলবার ছিলো না।

তবে কোন পক্ষই উচ্চকণ্ঠে কিছু বলছিলো না। কোন যুদ্ধ শেষ হবার পর দুই প্রতিপক্ষের যে অবস্থা হয়। অবশ্য কণ্ঠস্বর উচ্চ হলেও কিছু যেতো আসতো না কারণ কামরার একমাত্র শ্রোতা হিমালয় নির্ঝরিণীর—শ্রীমান মাতুলী-ভ্রাতা কাদা হয়ে নিদ্রামগ্ন। উপন্যাসের ফরমুলা অনুসারে এরকম ক্ষেত্রে তার ঘুমিয়ে থাকারই কথা।

বিশেষত মাঝের স্টেশনে তাকে একটা আইস্‌ক্রীম কিনে দিয়েছিল স্তম্ভ নির্ঝরিণী। সেটা ভাঙ মিশ্রিত কুলপী বরফ ছিলো কিনা কে জানে! কে জানে ইচ্ছে করেই ঐ রকম একটা আইস্‌ক্রীম কিনে দেওয়া হয়েছিলো কিনা মাতৃলীর ক্রিয়া বন্ধ করার জন্য।

তারপর থেকেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কণ্ঠস্বর একটু একটু করে নামতে নামতে একেবারে খাদে এসে পৌঁছেচে। আর লেখক হিসেবে গোয়েন্দাদের মতো সেই খাদে নামা আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভবই। তবে ট্রেনের ঘটাং ঘটাং শব্দের মধ্যেও যে দু-চারটে গাল লাল-করা কথা খাদ থেকে ছিটকে উপরে উঠছিলো তা বলে আর পাঠক পাঠিকার লোভ বাড়াতে চাইনে।

অবশেষে কৃষ্ণনগর এসে ধরা গেলো দুজনকেই। হাতে নাতেই ধরা পড়লো এবার। বামাল।

কিন্তু ততক্ষণে লালগোলা প্যাসেঞ্জারই শুধু এগোয়নি, অশোক-স্তম্ভ চন্দের হৃদয়ের ইঞ্জিনও দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে। স্টেথিস্‌কোপ থাকলে দেখা যেতো, চন্দের বুকের ভিতরকার হৃদ্‌পিণ্ড নামক বস্তুটি ট্রেনের থেকেও দ্রুতগতিতে হাকুড় পাকুড় করছে। ফলে, মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তার গলার স্বর কখনও ভেঙে আসছে, কথা ও চোখ জড়িয়ে আসছে। ইতিহাস পড়েও অনৈতিহাসিক কথা বলছে। ন্যায় বহির্ভূত তো বটেই।

যখন অশোকস্তম্ভকে ধরা গেলো তখন সে বলছিলো: বাঙালী মেয়েদের মনের কথা আর বলো না। বিলিতি মেয়েদের মতোই হচ্ছে তারা। এ সপ্তাহে জন্‌-এর সঙ্গে ঘুরলো, মন নেওয়া দেওয়া করলো, এনগেজমেণ্ট রিঙ্‌ পরলো। পরের সপ্তাহে দেখা গেলো হ্যারীর সঙ্গে! আবার সেই ঘোরা, মন দেওয়া নেওয়া, আংটি পরা। কী ব্যাপার! না, আই হ্যাভ্‌ চেঞ্জড্‌ মাই মাইণ্ড।

শ্রীমতী হিমালয় নির্ঝরিণী দত্ত মুচকি হেসে বলেছিলেন: আর তোমাদের বাঙালী ছেলেদের কাণ্ড কারখানার প্রত্যক্ষ উদাহরণ

শুনবে ! আমার আপন পিসতুত বোন, তার বর। সে ভদ্রলোককে আমার পিসেমশায় উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। ওমা, সে ভদ্রলোক •কিনা সেখানকার বনে যেয়ে বনবিড়াল হয়ে বসলো। আজকে এ সেলস গার্ল, কালকে অমুক রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেসের পিছনে পিছনে ঘুর ঘুর করতে লাগলো। বিলেত তো আমাদের দেশ থেকে রক্ষণশীল। ভদ্র ও অভিজাত ঘরের মেয়েরা সহজলভ্য নয়। চাকুরী করে খায় সাধারণত নিচু জাত আর গরীব ঘরের মেয়েরা। তাদের ধারণায়, ভারতীয় মাত্রেই আগা খাঁ, আর গাইকোয়াড়ের ছোট ভাই। সুতরাং সেই সব পেত্নীরা এই সব তথাকথিত আগা খাঁদের ঘাড়ে চেপে বাকী জীবনটা সুখে কাটাবার তালে থাকে। আর আমাদের দেশের ছোকরারা তাকেই প্রেম মনে করে হন্যে হয়ে পিছু পিছু ছোটে। সোজা কথা তো নয়, একটা শ্বেতাঙ্গিনী নীলনয়নার আঁখির আকর্ষণ (এদেশে আনলে কেই-বা জানতে চায় তাদের গোষ্ঠীর পরিচয়) তো কম নয় ! আমাদের জামাইবাবু ছোকরারও তখন দশম দশা আর কি। এদিকে ওখানে-থাকা আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে জামাইবাবুর বেলেল্লাপনার সংবাদ পেয়ে পিসতুত দিদি বেচারার তো নাওয়া খাওয়া শিকেয় ওঠলো আর কি ! ছোকরাকে দিদি খুব ভালবাসতো কি না। শেষে আমার এক মাসীমার বুদ্ধিতে সোজা পিসতুত দিদি বিলেতে যেয়ে এভেনমোড় রোডের বাড়ীওয়ালীর বাড়ী থেকে নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে এনে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।

অশোকস্তম্ভ উদাহরণ শেষ হতেই চমকে ওঠে। চমকে উঠে দ্রুতকণ্ঠে বলে : ইয়ে তোমার দিদি জামাইবাবুর নাম কি বল তো লক্ষ্মীটি ! কোথায় থাকেন তাঁরা ?

—কোথায় আবার, ঐ তো তোমাদের বাগবাজারের হায়হায়রাম কারফরমা লেনের একের একের জেড়্‌ নম্বর বাড়ীটা। লাল রঙের বাড়ী। একটা মাধবীলতার গাছ উঠে গেছে দোতলা অব্‌ধি। কেন,

জিজ্ঞেস করবে বুঝি তাদের ? আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হলো না। তীব্র দৃষ্টিতে তাকান হিমালয় নির্ঝরিণী।

স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে খাদ থেকে পাহাড়ী রাস্তায় পড়ে অশোকস্তম্ভ : হিমালয় গো, আজকে আমার এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় হলো। তুমি তাহলে আমার বীণাবাদিনী বৌদিদির মামাতো বোন, অঁ্যা অ্যাতোক্ষণ বলতে হয়! এমন সুন্দর পথ থাকতে আমি কি না হিমালয় শৃঙ্গে ওঠার চড়াই-উৎরাই-এর পথে যাচ্ছিলাম গো!

বলেই না যা কাণ্ড করে বসলো অশোকস্তম্ভ তা কোন মতেই ন্যায়শাস্ত্রের বিষয়বস্তু বলা চলে না। অথবা ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকার দরুনই সে কাণ্ড অশোকস্তম্ভ চন্দের।

রুমাল দিয়ে গণ্ডদেশ মুছতে মুছতে লাল হতে হতে বললেন নির্ঝরিণী দত্ত : আহা, বীণাবাদিনী দিদির ঠাকুরপো না হলে বুঝি তোমার সঙ্গে এত ফষ্টিনষ্টি করি!

—অঁ্যা, তবে—তবে তুমি জেনে শুনেই—মানে আগেই আমাকে চিনতে! বিস্ফারিত মুখে অশোকস্তম্ভের জিজ্ঞাসা।—মানে জেনে শুনেই আমার কামরায় উঠে ডাকাতি করার মতলব ছিলো তোমার!

—হ্যাঁ গো মশাই হ্যাঁ। জেনে শুনে না তো কি ? বহরমপুর থেকে আই. এ. পাশ করে কোলকাতায় কলেজে পড়ি, সপ্তাহে এক-আধবার করে পিসেমশায়ের বাড়ী যাই। তোমাকে এক আধদিন সেখানেই দেখেছি। তুমিও তো মাঝে মাঝে যাও সেখানে। তবে না মশায়ের মেয়ে দেখলে শরীর শিউরে ওঠে ? মেয়েদের তুমি দেয়াল দেখাও। তাই না ? বীণাবাদিনী দিদির কাছে তোমার এই সব কথা শুনেই তো তোমাকে ঘায়েল করার মতলব আমার। নইলে আর কি ? অমন চোয়াড়ে চেহারা, অমন চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, এমন বিচ্ছিরী রকমের সুন্দর চেহারা পছন্দ করতে ভারী বয়ে গেছে আমার। নিছক প্রেস্টিজ্ ফাইট্।

—নিছক প্রেস্টিজ্ ফাইট, মানে ?

—মর্যাদার লড়াই, ইলেকশনে দেখোনি ? না, এম. এ. ক্লাশের এক নম্বর ছাত্রকে তা বলে দিতে হবে ! মেয়েদের পক্ষ থেকে নিজেই এগিয়ে এসেছিলাম। যখন শুনলাম সমগ্র নারী-জাতির উপর বিদ্বেষ পোষণ কর তুমি। ভেবেছিলাম তোমার হোস্টেল না মেসে যেয়েই চ্যালেঞ্জ করবো। কিন্তু গত পরশু দিন বীণাবাদিনী দিদিদের বাসায় যেয়ে শুনলাম তুমি মুর্শিদাবাদ যাচ্ছো, আর যাচ্ছো এই ট্রেনেই, সঙ্গে সঙ্গে প্রোগ্রাম ক্যানসেল করলাম। ছোট ভাইটি এসেছিলো মামার সঙ্গে কোলকাতায়, তাকে নিয়েই যুদ্ধ জয়ে বেরিয়ে পড়লাম। জানই তো শরৎকালে প্রাচীনকালের রাজারা যুদ্ধে বেরুতেন !

বক্তব্য শেষ করে রাজার মতো, না—রাণীর মতো দীপ্তমুখে বিজিতের দিকে তাকালেন হিমালয় নির্ঝরিণী দত্ত।

আর অশোকস্তম্ভ বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে হাবুডুবু খেতে খেতে এই অঘটনঘটনপটিয়সীর দিকে প্যাট প্যাট করে তাকায়। বিজয়িনী রাণীর প্রতি পরাজিত সামন্তের দৃষ্টিভঙ্গীই ফুটে ওঠে। সীমান্তে পৌঁছুবার আগেই।

সেদিকে লক্ষ্য করে পরম নিস্পৃহ কণ্ঠে বলেন দত্তকুমারী : কিন্তু যাই বল বাপু, তোমাকে কিন্তু বিয়ে টিয়ে করতে পারবো না তা বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ।

—কেন, কেন ?

অশোকস্তম্ভের আকুল জিজ্ঞাসা। এমন তীরে এনে তরী ডুবানো কেন এমন করে। অ্যাঁ, এর মধ্যেই আই হ্যাভ্ চেঞ্জড্ মাই মাইণ্ড ! কিন্তু ডুবন্ত মানুষও তো খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়। সেদিকেই শেষ চেষ্টা চন্দের : ইয়ে, কেন বিয়েটা কি খারাপ জিনিস ?

উল্টো বিয়ের ওকালতি করতে আরম্ভ করে অশোকস্তম্ভ চন্দ ওকালতির ছাত্র না হয়েও।

—কথায় বলে বিয়ে না করলে মানুষ পূর্ণ বলে গণ্য হয় না। বিয়ে না করে কে বড় হয়েছে বল ? অমন যে গৌতম বুদ্ধ, মহাত্মাজী—

তাঁরা বিয়ে করেন নি? আর পুরাণের কথাই যদি ধর, রামায়ণে কে বিয়ে করেনি বল?

—কেন হনুমান। হনুমান বিয়ে করেছে? সে ভদ্রলোক তো সারা জীবন সীতা দেবীর চরণ দর্শন করেই কাটিয়ে দিলো। আর রামায়ণে হনুমান কি যা তা লোক? তাকে বাদ দিলে রামায়ণের কী থাকে? রামচন্দ্রকে সারাজীবন ভেউ ভেউ করে কাঁদতে হোতো না সীতার জন্যে! সীতা উদ্ধার তো দূরের কথা—সীতার খোঁজ পেতেন তোমাদের রামচন্দ্র! রামচন্দ্র কহ! হিমালয় নির্ঝরিণীর পৌরাণিক যুক্তি।

—কিন্তু আমি কি হনুমান! আমাকে কি শেষ পর্যন্ত হনুমান ঠাওরালে তুমি, অ্যাঁ! তাহলে রামায়ণের শূর্পণখাও তো বিয়ে করে নি। তাই বলে তুমি কি শূর্পণখা!

হিমালয় নির্ঝরিণী ব্যঙ্গ কণ্ঠে বলেন: ভারী তো রামায়ণ পড়েছো দেখছি। শূর্পণখা বিয়ে করেনি, না? আর রামায়ণ মহাভারত তুলে যে বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছ, রামায়ণের দশরথ রাজা ক'টা বিয়ে করেছিলো জানো?

দশরথ রাজার সাতশত রাণী
কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা মুখ্যা তিন গণি।

তাই বলে কেউ সাত-শো বিয়ে করবে নাকি কুলীনদের মতো বিংশ শতাব্দীতে! কেষ্ট ঠাকুরের তো যোলশ' গোপিনী ছিলো। অবশ্য আজকালকার ছেলেরা তো এক একটি কলির কেষ্ট। শুধু শিখিচূড়া আর বাঁশী হাতে দিলেই কদমতলা খুঁজে নিতে দেরী হয় না তাদের। বলি একজনকেই ভাত দিতে পারে না, তার আবার সাত শ', ষোল শ', হুঁ:—।

অশোকস্তম্ভ সবিনয় নিবেদন করে: ইয়ে, যে পারে না সে পারে না, জান তো আমার বাবামশাই জমিদার ছিলেন?

—ছিলেন তো ছিলেন। পাকিস্তানের কোন এঁদো পচা গাঁয়ের জমিদার, তার ছেলের আবার কথা! এ-যেন সেই 'জান

আমি কেমন ঘরের ছেলে, আমার মেসোমশাই থানার দারোগা।'

আহারে!

হিমালয় নির্ঝরিণী ঝর্ণার মতো হাসিতে ভেঙ্গে পড়েন। হাসলে চমৎকার ছুটো টোল পড়ে ছুই গালে।

কিন্তু তা দেখার কি আর সময় আছে! সেসনকোর্টে ফাঁসীর আসামীর কি আর জজ সাহেবের হীরের আংটির দিকে তাকাবার সময় হয়! ভরাডুবির সময় কি আর ডুবুরী সাজতে ইচ্ছে যায়! মুক্তো খুঁজতে তো ইচ্ছে করে কিন্তু নির্ঝরিণীর ঝর্ণার জলে নামতে দিচ্ছে কৈ? এ যেন এভারেস্টের চূড়ার তিনশ' ফিট নীচে এসে তুষার ঝড়ের তাড়ায় হতাশা নিয়ে পশ্চাৎপদ হওয়ার মতো।

ওদিকে হিমালয় গর্বোন্নত শির তুলে মজা দেখছে। পেয়েই বসেছে চন্দকে। দোতালায় রাখা সন্দেশ, হাতে না পাওয়া পর্যন্ত যা আকুলি বিকুলি। একবার হাতের মুঠোয় এলে তখন আবার কি?

বেল পাকলে কাকের কি?

তবু, তখনও অশোকস্তম্ভের ধৈর্য্যচ্যুতির লক্ষণ দেখা যায় না। আর একবার মুখ খুলতে দেখা যায় তাকে: জানো আমি অধ্যাপক হতে পারি। ইচ্ছে করলে আই. এ. এস. পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারি। হাকিম হয়ে বসতে পারি।

—তা পারো। মামলা থাকলে তোমার কোর্টেই না হয় যাবো। কিন্তু কোর্টের হাকিমের সঙ্গে কোর্টসিপ করা যায় না। কোন সিপ্‌ ভিড়ানো যায় না ঐ জেটিতে, বুঝলে! আর বাঙলা দেশের অধ্যাপক! তাঁদের কথা আর বলো না। তাঁদের ছাত্রী হওয়া যদিও যায়, পাত্রী হওয়া অসম্ভব। আসল কথা শোন মশাই, তুমি আমাকে পুষতেই পারবে না। মাসে আমার যা প্রসাধন খরচ, তোমার অধ্যাপকগিরির টাকায় তা কুলুবে না। কুলপী বরফ খেয়েই তা সাবড়ে দেবো আমি। কাজ কি বাপু হাতি পুষে? একটা বেড়াল টেড়াল খুঁজে দেখোগে, চাও তো আমি না হয় খুঁজে পেতে

দেবখন। বীণাবাদিনী দিদির ঠাকুরপো তুমি, আমি না হয় এটুকু উপকার করেই দিলাম। হিমালয় নির্ঝরিণী পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দেয়।

—থাক, উপকার করতে হবে না আমার কাউকে। ফোঁস ফোঁস কণ্ঠে বলে অশোকস্তম্ভ। আমিই বিড়াল খুঁজে নিতে পারবো'খন। আর মেয়েরা তো এক একটা বিড়ালই। বিড়ালীই তো তারা। বিড়ালাক্ষী তো তোদেরই বলে থাকে লেখকেরা। আর বিড়াল না পাই ইঁদুরই ধরবো। ইঁদুর কিভাবে ধরতে হয় জানা আছে আমার, কাউকে ধরে দিতে হবে না।

—অমনি বাবুর রাগ হয়ে গেলো তো! ভাল কথা বললাম, এতে রাগের কী আছে বুঝিনে। কোথায় ভাববে, যাক বেঁচে গেলাম, আর একটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি? শেষে বিয়ে করে ছুদিন বাদে যখন মজা পাবে তখন!

অশোকস্তম্ভের দিক থেকে এ-কথার সাড়া আসে না। সেদিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে একটু হাসেন নির্ঝরিণী। তারপর ধীরে ধীরে সলজ্জ কণ্ঠে বলেন: তা ছাড়া, হাজার হলেও আমি মেয়ে, আমার মা বাবা আছেন। তাঁদের মত নিতে হবে না?

হিমালয় নির্ঝরিণী আর একবার লাল হন।

—অ্যাঁ, তাহলে তুমি রাজি?

উচ্ছ্বাসে হিমালয়কে আঁকড়ে ধরে পতন বাঁচাতে চেষ্টা করে অশোকস্তম্ভ। ভাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে, সেই আঁকড়ানোকে প্রশ্রয় দিতে দিতে মুখটাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে বলেন দত্তকুমারী: হ্যাঁ গো মশাই, হ্যাঁ। এবার সরে বসো দেখি। ভাইটি রয়েছে না! তোমার পাল্লায় পড়ে যে বেহায়াপনা দেখালাম আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এমনটা দেখা যায় না। ছেলেরা যে প্রেমে পড়লে এমন হয়ে হয় ধারণা ছিলো না আমার।

—আরে রেখে দাও তোমার ধারণা। কটা প্রেম করে দেখেছো তুমি, শুনি?

এবার রাজ্য বিজয়ীর কণ্ঠ অশোকস্তম্ভের।

—হ্যাঁ, তাই বলি আর কি? ঐসব বুঝি কেউ আবার বলে! তোমরা ছেলেরাই বল না।

—বেশ তো বলি না তো বলি না। ছেলেরা যেন একা একাই প্রেম করে। মেয়ে ছাড়াই যেন প্রেম হয়! ছাড়া পেলেই যে গরু অপরের ক্ষেতে মুখ দেয় একথা কে না জানে! থাক সে কথা, ইয়ে, তোমার বাবা মাকে বলি কী করে বলতো গো!

অশোকস্তম্ভের আবার আকুলতা। কূল পেয়েও নোঙর ফেলতে দিশে পায় না সে।

—বারে, সে কথাও আমি বলে দেব নাকি? না বাবাকে যেয়ে বলবো, ছ্যাখো বাবা, এই ভদ্রলোকটি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছেন। ইনি অতীব সৎপাত্র। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। পরের ক্ষেতে কোনদিন মুখ দেবেন না। আমার প্রসাধনের ব্যয় (আমার এ কালোরূপ ঢাকতে) ইনি বহন করতে রাজী আছেন, তাই না! জানো, বাবা এককালে নামকরা বক্সার ছিলেন। এখনও একটা ঝুনো নারকেল এক ঘুসিতে ভাঙতে পারেন। হুঁশিয়ার ছোকরা, বুঝলে! শেষে

'এ ফুল তো ফুল নয় ঘেরা কাঁটা দিয়ে
ওরে বাবা একি গ্রহ পালা প্রাণ নিয়ে।'—

তাই না হয়। যাকগে সে কথা, বহরমপুর এসে গেলো। চলনা গো আমাদের ওখানে। বীণাবাদিনী দিদির ঠাকুরপো বলে চালিয়ে দেবো'খন। বাকীটুকু চাল মেরে চালাবে তুমি। ছেলেরা তো বেশ চাল্লিয়াৎ হয়।

অশোকস্তম্ভ সেকথা গায়ে না মেখে বলে: সত্যি যাবো লক্ষীটি! ইয়ে, আমার মাথাটা কিন্তু ঝুনো নারকেলের চেয়ে শক্ত নয়। আহা আমার মাথাটা যদি ইটের মতো শক্ত হতো!

অশোকস্তম্ভের অনুশোচনা যায় না।

হিমালয় নির্ঝরিণী কী ভেবে বলেন : না, থাক। আমার সঙ্গে যাওয়াটা ঠিক হবে না তোমার। এমনিতেই ছোটভাইটিকে কত লজেন্স ঘুষ দিতে হয় কে জানে! সত্যিই কি আর সারাপথ ঘুমিয়েছে! মাঝে মাঝে কি আর জাগেনি! জেগে কি আর দেখেনি কেমন করে তার দিদির ঘরে সিঁধ কাটছে চোর। ধরেনি তাই রক্ষে। এরপর যদি বাসায় নিয়ে যাই আজকেই, তাহলে তো কথাই নেই।

—কিন্তু আমার, আমার যে অনেক কথাই বাকী রইলো লক্ষীটি!

—ও থাকে। সারা জীবন বলেও নাকি বলা শেষ করতে পারবে না তুমি? শুনেছি এম. এ কোর্সের মতই তা অসীম। যখন শেষ করবে তখন দেখা যাবে কিছুই তো বলা হলো না। সবারই এরকম হয়। ওজন্য দুঃখ করোনা লক্ষ্মীটি। ঐ যে স্টেশন এসে গেলো। কইরে খোকা, ওঠ দেখি ভাই, স্টেশন এসে গেছে।

হিমালয় নির্ঝরিণী গোছগাছ করতে থাকেন।

ফিসফিস করে বলে অশোকস্তম্ভ : আমি গোরাবাজারে কমল বাবুদের ওখানে উঠবো। ভালো কথা, কাল হাজার দুয়ারী দেখতে যাবো সকালবেলা, যেভাবে হোক যেও লক্ষ্মীটি, অনেক কথা আছে।

হিমালয় নির্ঝরিণী দুই চোখে কৃপা বর্ষণ করে বেরিয়ে যান। একবার পিছু ফিরে তাকান কিনা অশোকস্তম্ভের হা-করা চোখের দিকে কে জানে। রিক্সায় উঠে একটা নতুন আইসক্রীম সাবড়াতে সাবড়াতে খোকা ওরফে বিজিতেশচন্দ্র ওরফে বিতিকিচ্ছিরী চন্দ্র বলে : হ্যাঁরে দিদি, ট্রেনের ওই লোকটা ফিস্ ফিস্ করে তোকে কী বলছিলোরে দিদি?

নির্ঝরিণী এতক্ষণে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় খোকার দিকে। তারপর বলে : বলছিলো, খোকা তো লক্ষ্মী ছেলের মতো সারাপথ ঘুমিয়ে এলো, ওকে কিছু মিষ্টি কিনে দেই!

—কেন, কেন, সারা পথ ঘুমিয়ে আসাতে ও-লোকটা মিষ্টি কিনে দিতে চাইছে কেনরে দিদি? ও লোকটা বুঝি খুব মিষ্টি খাওয়ায় লোককে?

—হ্যাঁ, সুবিধেমত মুখ পেলেই মুখ মিষ্টি করেই তো!

নির্ঝরিণী নিজের মিষ্টি মুখের কথা ভেবেই বলে হয় তো।

—বা, বেশ তো! আমি বাড়ী যেয়েই বাবা মাকে বলবো দিদি, একটা লোক—বুঝলে বাবা, আমি সারা রাস্তা ঘুমিয়ে এসেছি বলে মিষ্টি খাওয়াতে চেয়েছিলো। দিদিকে ফিস ফিস করে নাকি তাই বলছিলো।

হিমালয় নির্ঝরিণীর হৃদয়ের ঝর্ণা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিলো এ-কথায়। দ্রুতকণ্ঠে বলেছিলেন: না, নাঁ, বাবা মাকে বলতে যাবি কেন এ-কথা। একি একটা বলার কথা খোকা! আর ও-কি একটা 'লোক'। ওতো বোষ্টম মানুষ। বোষ্টম দেখিস নি খোকা! বাবাকে বরং বলতে পারিস একজন বোষ্টম মিষ্টি দিতে চেয়েছিলো। সে বললেই যথেষ্ট।

—বোষ্টম! ঐ লোকটা, মানে বোষ্টমটা! কিন্তু বোষ্টমরা তো কপালে নাকে ফোঁটা কাটে। এ কেমন বোষ্টমরে দিদি?

—ও, ফোঁটা দেখিসনি তো! তা দেখবি কি করে, উনি তো নিফোঁটা বোষ্টম।

—নিফোঁটা বোষ্টম কিরে দিদি?

খোকা ওরফে বিতিকিচ্ছিরী চন্দ্র দত্তের কৌতূহল অসীম।

—নিফোঁটা বোষ্টম মানে যারা ফোঁটা কাটে না। ওকে নির্বোধানন্দ বোষ্টম বাবাজীও বলতে পারিস। নে থাক, ও বোষ্টম দিয়ে আমরা কী করবো। সে কোন বাগানে ফুটবেন তা দিয়ে দরকার কি আমাদের! আমি তো তোকে নিজের পয়সায়ই আইস্‌ক্রীম্ খাওয়ালাম। চাস তো আর একটা কালকে খাওয়াব'খন! কিন্তু ঐ বোষ্টমের কথা ভেবে ভেবে তুই-ও শেষে বোষ্টম হোস সেটা তো ভলো কথা নয়।

হিমালয় নির্ঝরিণী ভাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বৈষ্ণব-পথ থেকে সহজ পথে আনার চেষ্টা করেন।

পরদিন হাজার দুয়ারীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করার পর হিমালয় নির্ঝরিণীর দর্শন মিলেছিলো। কিন্তু কোন আলাপের সুযোগ আসছিল না। কারণ, হিমালয়ের সঙ্গে তার বর্ধমানের কাঞ্চনজঙ্ঘা মাসীমা, তার গৌরীশঙ্কর মেসোমশায় আর তাদের এক গাদা ছেলেপিলে। পিলেওয়ালা ছেলেই বেশী।

অশোকস্তম্ভ প্রথম দিকে হতাশই হলো। সত্যিই তো, এ কোন ধরনের চুক্তিভঙ্গ! অর্পিত বিশ্বাস ভঙ্গ কর'র অপরাধে ৪০৩ ধারা না কী হয় যেন। তা হোক, কিন্তু নির্ঝরিণীর চোখে কোন বিশ্বাসের লেশমাত্রও দেখা গেলো না। কোন কালেও যে অশোকস্তম্ভকে চিনতেন হিমালয় নির্ঝরিণী, তার বাষ্পটুকু পর্যন্ত সে চোখে নেই। নির্বোধ স্তম্ভের অসহায় অবস্থাটা একা দেখে আনন্দ হবে না বলে সবাইকে নিয়ে আসা হয়েছে। অথচ শর্তমতো হিমালয়ের একা আসার কথা। শুধু কি তাই, স্তম্ভের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কিনা আবার বলা হচ্ছেঃ বুঝলে মাসীমা, কালকে বাসায় যেয়ে তোমাদের দেখে যে কী আনন্দ হলো। আজকে তো আমার আসারই ইচ্ছে ছিলো না। শুধু তোমাকে আনন্দ দেবার জন্যই আসা।

মাসীমা বললেনঃ সে কিরে, তোর গরজেই না এলাম। নইলে হাজার দুয়ারী তো হাজার বার দেখার জিনিস নয় বাছা। তুই-ই তো বললি, একবার দেখে কি আর আশ মেটে মাসীমা। সেখানকার স্তম্ভই তো দ্যাখোনি। এক একটা স্তম্ভে সেকি কম কারুকার্য! হাজার দুয়ারীর হাজার দরজাই কি সব। চল যাই তোমাকে স্তম্ভ দেখিয়ে আনি।

হিমালয় নির্ঝরিণী বললেনঃ সে তো বটেই মাসীমা। তবু তোমাদের জন্যই তো আসা। বর্ধমানের যেমন সীতাভোগ, হাজার

হুয়ারীর তেমনি অশোকস্তম্ভ মানে নবাবীস্তম্ভ আর কি! কিন্তু কেন আসতে চাইনি জানো মাসীমা, একটা বোষ্টম উঠেছিলো কালকে আমাদের ট্রেনের কামরায়। মাছ খায় না, নির্ফোঁটা বোষ্টম মাসীমা।

মাসীমা বলেন: তোর যেমন কথা বাছা। বোষ্টমেরা আবার মাছ খায় নাকি? অবশ্য তোর মেসোর কথা আলাদা।

—কেন, কেন? পুরুষেরা সবাই বুঝি বোষ্টম হয় মাসীমা!

নির্ঝরিণীর সরলা গ্রাম্যবালিকার মতো জিজ্ঞাসা।

—সবাই হয় না। তোর মেসোমশায় তো বোষ্টম ছিলেন। আমার শ্বশুর মশাই পরম বোষ্টম ছিলেন তো। মাছ মাংস খেতেন না। কিন্তু তোর মেসোমশায়ের তো মুরগী ছাড়া এক বেলা চলে না। জানিসনে, সেজন্য তোর মা বলেন, মুরগী বোষ্টম।

—আঃ, ছেলেমানুষের কাছে কী যা তা বলছো! গৌরীশঙ্কর মেসো কাঞ্চনজঙ্ঘা মাসীমাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন।—এসব কথা ছেলেমেয়েদের কাছে বলতে আছে নাকি? ওদের এখন চরিত্র গঠনের সময়।

মাসীমা বললেন: আহা, আমি কি তাই বলেছি নাকি! তুমিই তো বল ছেলেমেয়েদের সামনে সত্যি কথা বলতে হয়।

হিমালয় নির্ঝরিণী বললেন: দ্যাখো মাসীমা, কালকে ট্রেনে তো আমাদের কামরায়, মানে মেয়েদের কামরায় এক বোষ্টমী উঠলো। তারপর—।

মাসীমা বাধা দিয়ে বলেন: সে কি রে, এই যে বললি, বোষ্টম!

—ঐ বোষ্টম আর বোষ্টমী একই বলতে গেলে।

হিমালয় নির্ঝরিণী ব্যাখ্যা করেন।

কিন্তু মাসীমার সে ব্যাখ্যাতে মন ওঠে না।

—বোষ্টম আর বোষ্টমী এক কি রে? এই রকম বুঝি পড়ায় আজকাল কলেজে! এই যে তোর বোষ্টম মেসো সঙ্গী হয়ে এসেচে, ওকে কি তুই সঙ্গীনী বলবি?

মেসোমশায় বাধা দেন : কী যে বল তুমি কাঞ্চনজঙ্ঘা, তার ঠিক নেই! এসব আলোচনা ছেলেমানুষদের সঙ্গে করতে আছে নাকি? ওরা সব কচি কিশলয়। কালের হাওয়ায় মৃদুমন্দ দোলে। তোমার আমার মত বৃদ্ধ জীর্ণ পত্র নয় যে উড়বে। তা যাকগে মা, তারপর সেই বোষ্টম না বোষ্টমী কী করলো?

—কী আর করবে, কেঁদে কেটে মাথা ধরিয়ে দিলো আমার।

—সে কি, বোষ্টমী তোর কাছে কাঁদতে গেলো কেন? অ্যাঁ? তুই কি একটা কাঁদবার জায়গা! তুই কি একটা গোঁসাঘর! কেন বাথরুমে যেয়ে কাঁদতে পারলো না বোষ্টমীটা! মাসীমার ক্ষোভ যায় না।

—আহা মাসীমা, বাথরুমে যেয়ে কাঁদতে দিলে তো আমি! আমি হাতে নাতে ধরে ফেললাম যে!

হিমালয় নির্ঝরিণী হাতে নাতে ধরার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

—অ্যাঁ, চুরি ধরলি বুঝি, না চোর ধরলি? তাজ্জব বুকের পাটা তো বোষ্টমটার!

গৌরীশঙ্কর মেসোমশায় আপত্তি করেন : বোষ্টমটার বুকের পাটা দেখলে কোথায় তুমি। ইয়ে, বুকের পাটা বলতে হয় আমার এই মা-মণির। সাবাস্ মা। এই সব চোর বাটপাড়গুলো যদি তোদের মতো মেয়েদের কাছে শায়েস্তা হয়। ছেলেগুলোর উপর আমার কোনই আস্থা নেই। আজকালকার ছেলেদের চরিত্র গঠনই হলো না।

—ঠিকই বলেছেন মেসোমশাই। আজকাল ছেলেরা তো সব শায়েস্তাখাঁ। শিবাজীর ভয়ে নয়, শিবা মানে শেয়ালের ভয়েই জানালা দিয়ে পালায়। আর আজকালকার ছেলেদের তো মেরুদণ্ডই নেই। সেই যে কালকের সেই বোষ্টমটি, তার মেরুদণ্ড তো সাপের মতো, না না ভুল বলছি কেঁচোর মতো।

হিমালয় নির্ঝরিণী পিছু পিছু আসতে থাকা অশোকস্তম্ভের দিকে কৌণিক দৃষ্টিতে তাকিয়েই শব্দগুচ্ছ ছুঁড়ে দেন। আর তার প্রতিটি শব্দ শব্দভেদী বাণ হয়ে চন্দের বুকে বিঁধতে থাকে।

দেখেছো কাণ্ডটা! আমি নাকি বোষ্টম! আর আমার মেরুদণ্ড নাকি কেঁচোর মতো! আমি নাকি চুরি করে হাতে নাতে ধরা পড়েছি!

অশোকস্তম্ভের মনে এসব কথা উদিত হওয়া আশ্চর্য নয়। প্রতিবাদই করতে ইচ্ছে করে তার।

কিন্তু স্তম্ভ নয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা মাসীমাই প্রতিবাদ করেন: সত্যিই তুমি অনবরত ভুলই বলছো বাছা। স্তম্ভ দেখাতে এসে ক্রমাগত আবোল তাবোলই বকছ। একবার বলছো বোষ্টম আবার বলছো বোষ্টমী। তোমার এখনও পুরুষলোক আর মেয়েলোকে পার্থক্য জ্ঞান হয়নি।

মেসোমশায় বললেন: সেটাই তো জ্ঞানের লক্ষণ কাঞ্চু। এমন সরল সহজ মেয়ে আর দেখেছো তুমি! নারী ও পুরুষে যে মেয়ে পার্থক্য বোঝে না তার মনই তো জলের মতো পরিষ্কার।

অশোকস্তম্ভ চন্দ সেই জলের দিকেই আড়চোখে তাকিয়ে দেখে। জলই বটে। তবে পরিষ্কার কলের জল নয়, গঙ্গার ঘোলা জল।

মেসোমশায় তখনও বলে চলেছেন: আবার পুরুষ এবং প্রকৃতি একই, বুঝলে কাঞ্চন! থাক্‌গে সে সব তত্ত্বকথা। তারপর কী হলো মা?

—আর কি হবে মেসোমশায়! ছেড়ে দিলাম। চোর দিয়ে আর কি করা যায় মেসোমশায়। অবশ্য বাজার করার জন্য বাড়ীতে এনে রাখলে হতো। বাজার যারা করে তারা তো চোরই। কিন্তু ভাবলাম যদি এ চোর রাত্রে ডাকাত হয়! ডাকাত হয়ে সবকিছু লুণ্ঠন করে! তাই তো ছেড়ে দিলাম।

—কেন, ছেড়ে দিলি কেন? চোরকে পুলিশে না দিয়ে ছেড়ে দিলি? তুই কেমন মেয়ে বাছা বুঝিনে।

মাসীমার অনুশোচনা যায় না।

—আহা মাসীমা, পুলিশরাই তো চোরকে ছেড়ে দেয়। দেদার ছেড়ে দেয়। চোরে পুলিশে মাসতুত ভাই, জানো না। ছোটবেলায়

যেমন চোর-পুলিশ খেলে, তেমনি পুলিশেরা চোর নিয়ে খেলে। আমাদের পাড়ায় একটা গুণ্ডা ছিলো। একদিন গুণ্ডামি করার জন্য সবাই মিলে তাকে পুলিশে দিলে। ওমা, থানার দারোগাবাবু তাকে ছেড়ে দিলেন। উল্টে বলেন কিনা, যারা ধরেছে তারাই আসলে গুণ্ডা, নইলে গুণ্ডা ধরলো কি করে। নিশ্চয়ই গুণ্ডাটি ভালমানুষ।

হিমালয় নির্ঝরিণী হাজার দুয়ারীর পঞ্চাশ নম্বর ঘর ও স্তম্ভ দেখতে দেখতে বলে।

কিন্তু এ কথায় মোটেই মাসীমার মন ওঠে না। বলেন: কিন্তু তাই বলে তুই ছেড়ে দিবি? পুলিশ যদি ছাড়ে সে হচ্ছে তাদের দায়িত্ব। তাকে ছেড়ে দিয়ে তোকে যদি হাজতে পুরে দেয় তাও তাদেরই ব্যাপার। কারণ তোকেও তারা না ছেড়ে পারে না।

—কেন মাসীমা, আমাকে ছাড়বে কেন?

—ছাড়বে না! পুলিশেরা যদি সব চোরকেই হাজতে ঢোকায় তাহলে হাজার দুয়ারীর সব ঘরেও কুলুবেনা। তাছাড়া সেই ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাদের দু' পয়সা হয়। তুই কিনা কলেজে পড়ে তাদের দু'পয়সা রোজগারে বাধা দিলি? এই সেদিনও না, 'পুলিশদের ভাইয়ের মতো ছাখো' বলে একজন মন্ত্রীমশাই বলেছেন! মন্ত্রী-মশায়ের কথা না হয় নাই শুনলি, কিন্তু ভাইদের! ভাইদের দু'পয়সায় বাগড়া দিলি কেন? তোমাকে এতো করেও গড়া গেল না।

মাসীমা বিগড়ানো বোনঝিকে দিয়ে অপর কাউকে শেখাতে চান কিনা বলা যায় না। ভাবী পুত্রবধূকেই হয় তো। তারপর বলেন,

—তোর মেসোমশায় বর্ধমানে চোরদের জন্য দরজা খুলে শোয়, জানিস? ঐ লোভে পড়ে চোরেরা যেই ঢোকে অমনি তাদের পুলিশের হাতে দিয়ে দেয়। পুলিশেরা পাশের ঘরে দরজাবন্ধ করে শুয়ে থাকে তো!

মেসোমশায় প্রতিবাদ করেন: আঃ, এতটুকু মেয়েকে এইসব বয়স্কদের উপযুক্ত কথাবার্তা শুনিয়ে কেন যে চরিত্র গঠনে বাধা দিচ্ছ

বুঝিনে কাঞ্চনজু। এতক্ষণে সে অনেকদূর আসতে পারতো চরিত্র গঠনের পথে।

হিমালয় নির্ঝরিণী বলেনঃ না মাসীমা, আমি চোরকে ছেড়ে দিয়েছি বটে কিন্তু তাকে আবার আসতে বলেছি।

—ঐ তো,তোমার কথার কোন ব্যালান্স্ মানে তুলাদণ্ড নেই বাছা। একবার এ পাশ ভারী করছো, আবার ওপাশ। একবার বলছো, ছেড়ে দিয়েছি, আবার বলছো আসতে বলেছি! ছেড়ে দেওয়া, আর আসতে বলা কি এক! কী যে আজকাল তোদের কলেজে শেখায় বাছা বুঝি নে। ছেড়ে দিয়ে যদি আসতে বললি, তাহলে তো যেতে বলে আসতে বলাই হলো। এখন তোর চোর কী করে বুঝবে মেয়েদের 'না' মানেই 'হ্যাঁ'। তার যে পরশুরামের সেই গল্পটা পড়া থাকবে তার কি মানে আছে?

—মানে আছে মাসীমা, মানে আছে। মানে বই ছাড়া আজকাল এক পা নড়ে না ছেলেরা। একি তোমাদের সময়কার কলেজ মাসীমা! এখনকার ছেলেরা—মানে চোরেরা মানে-বোঝার জন্য ঘুর ঘুর করে ছাতের কার্নিশে। তাই তো অশোক, না ইয়ে—চোরকে হাজার হুয়ারীতে দেখা করতে বলেছিলাম এক সপ্তাহের মধ্যে। হাজার হুয়ারীতে তো আমরা মাঝে মাঝেই আসি। এরপর কালনার মামার পিসতুত বোনের ননদ, জামাইকা থাকেন যে-নতুনদি'র জামাই তিনি, এমন তো কতজনকে স্তম্ভ দেখাবো। অবশ্য এখানেও আসতে পারে চোর, অথবা বীণাবাদিনী দিদির ওখানে ধরলেও হয়। তিনি প্রশ্রয় দিলেই বাজার সরকারী পাকাপাকি হতে পারে, কী বল মাসীমা! হিমালয় নির্ঝরিণী মাসীমাকেই যেন চোর ভেবে পথ বাৎলান।

কিন্তু মাসীমা সে বাৎ শুনে, বোনঝির বিদ্যাবুদ্ধি নয় মস্তিষ্ক সম্পর্কেই যেন সন্দেহ করেন।

—তোর মাথায় নিশ্চয়ই আজ কোন গোলমাল হয়েছে বাছা। অশোক, না ইয়ে চোর, এসব আবোল তাবোল—মানে যা তা বোল

বলছিস কেন অ্যাঁ? অশোকের সঙ্গে চোরের কী সম্পর্ক! অশোকের সঙ্গে না হয় বিন্দুসারের সম্পর্ক আছে। বিম্বিসারের সঙ্গেও থাকতে পারে, জানি নে। কিন্তু অশোক চোর হতে যাবে কেন? নাকি বোষ্টমী চোরটার নাম অশোকা না কি তুই-ই রামবোকা। কাল রাতেও একবার চন্দ চন্দ করে উঠেছিলি। তোর রকম সকম দেখে আমার তো ধন্দই লাগে বাছা। কাজ নেই আর স্তম্ভ দেখে, তার চেয়ে বরং বহরমপুরেই ফিরে যাই বাছা।

মাসীমা এমন গোলমেলে বোনঝি নিয়ে বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে চান না।

—কিন্তু মাসীমা চোরটাকে মানে সেই বোষ্টমটাকে নিয়ে এখন কি করি? চোরটা যদি এখানেই আসে?

—তা আসুক। কিন্তু তাই বলে আমরা থাকতে একটা চোরের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলতে দিতে পারিনে আমরা। ওটা বরং পুলিশেরাই করুক। তুমি বাছা ঘরে ফিরে চল যাই।

—তাই চল মাসীমা। চোর যদি আসেই তবে না হয় বীণাবাদিনী দিদির ওখানেই যাবে। বীণাবাদিনী দিদি চোর ধরতে খুব ওস্তাদ তা জান তো! ঐ যে সেবার বিলেত থেকে চোর ধরে নিয়ে এলো! তবে বীণাবাদিনী দিদি একবার ধরলে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। আমার জন্যেই রেখে দেবে। ছুটো চোর নিয়ে কী করবেন তিনি।

হিমালয় নির্ঝরিণীরা বেলা থাকতেই চলে গিয়েছিলেন।

তারা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে একটা পতনের শব্দ হয়েছিলো। তেমন কিছু নয়, অশোকস্তম্ভ বসে গিয়েছিল আর কি! না, পথে নয়, হাজার দুয়ারীর যে ঘরে গেস্ট্‌রা এসে বসেন, সেই ঘরের একটা অতি নরম সোফায়।

মুর্শিদাবাদ জয় করে (!) অশোকস্তম্ভ কোলকাতায় ফিরে এসেছিলো এখবর আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে পেয়েছিলাম। কিন্তু ক্লাবে

তার আগমন ঘটলো না। একদিন, দুদিন, তিন দিন। না, সাত দিনেও তার বাবরি দেখা গেলো না। গঙ্গাধর গাড়ুই বললেন: ছোকরার অসুখ বিসুখ হলো টলো নাতো? গোবর্ধন বর্ধন বললেন: ঐ শরীরের অসুখ! আমার পত্নী অবলা সরলা বর্ধন তাকে বর্ধমান রোড দিয়ে অ্যাণ্ডারসনের বাড়ীর দিকে শন্ শন্ বেগে যেতে দেখেছেন।

কালীপদ নাজির মিত্র চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললেন: তাই নাকি? ভাবিয়ে তুললো তো অশোকস্তম্ভ। মিউজিয়ামে তাকে দেখা গেলে আশ্চর্য হতাম না, কিন্তু বর্ধমান রোডে কেন?

চিত্তবিমোহন দাস বললেন: ভেবেছিলাম ছোকরা ফেরার পর আর একবার আক্রমণ চালানো যাবে। কিন্তু এমন ফেরার হবে তা তো জানতাম না। অবশ্য আমার শ্যালিকা কুমকুম সুবেশা বলেন, পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে চন্দ্র কিছুতেই যেতে পারে না। নিজেকে অবশ্যই তিনি পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন। শীগগিরই যে তিনি চন্দ্রে অভিযান চালিয়ে তাকে জয় করে ফেলবেন সে পরিকল্পনাও কুমকুম সুবেশা করে ফেলেছেন। এখানে অবশ্য চন্দ্র বলতে চন্দকেই 'মীন্' করছেন আমার শ্যালিকা। আমরা সমস্বরে উৎসাহিত কণ্ঠে এই চন্দ্র বিজয়ের পরিকল্পনা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

চিত্তবিমোহন দাসবাবু বললেন: কাউকে বলবেন না। ছোকরার দৈনন্দিন কার্যসূচী সংগ্রহ করা হচ্ছে। যেমন ধরুন, সকাল বেলায় কোন গঙ্গার বায়ু সেবন করেন তিনি। কুমকুম সুবেশা সেখানে বায়ু সেবনে যাবেন। কোন পার্কে তার গাড়ী পার্ক করে (অবশ্য গাড়ী থাকলে) কুমকুম সুবেশার 'আর্ক' সেখানে ভিড়বে। কোন পুকুরে দুপুরবেলা স্নান করে অশোকস্তম্ভ তা জেনে সেখানে সুইমিং কস্ট্যুম পরে সাঁতার কাটবেন। যে সিনেমা দেখবে সেই সিটের পাশের সিটে বসবেন।

রবিবিষ্ণুপদ নন্দী এক সময় তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। বললেন: ইয়ে চিত্তবিনোদন দাসবাবু, যদি অশোকস্তম্ভ কলের জলে চান করে, তাহলে আপনার শ্যালিকা কী করবেন?

জয়জগদীশ্বর সাহা বললেন : কেন চিংড়ি মাছের ছদ্মবেশ নিয়ে জলের কলের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবেন। কোন্ মিউনিসিপ্যালিটির জলের পাইপ থেকে মাছ পড়েছিলো পত্রিকায় পড়েন নি ? নিশ্চয়ই সেখানে কোন সুবেশা কুমকুম দত্তের মতো শ্যালিকা থেকে থাকবেন।

চিত্তবিমোহন বললেন : রবিবিষ্ণুপদ নন্দী মশাই, আমার নাম চিত্তবিনোদন নয়, চিত্তবিমোহন। আর জয়জগদীশ্বর সাহা মশাই, আপনি আমার শ্যালিকাকে কটাক্ষ করবেন না। তিনি সুবেশা কুমকুম নয়, কুমকুম সুবেশা। এই নামের অভিনবত্বের জন্য এক সিনেমা কোম্পানী তাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলো। এটা অবশ্য আমার শ্যালিকার কাছেই শোনা।

রবিবিষ্ণুপদ বললেন : মশাই, আমার কটাক্ষ করার বয়স থাকলেও উপায় নেই। সংসার কটাহে একবার শোল-পোড়া হলে সে অক্ষিতে আর কটাক্ষ থাকে না।

আমরা বললাম : চিত্তবিমোহন দাসবাবু, বালকদের কথায় আপনি অগ্নিকটাহ হবেন না। আপনার শ্যালিকার পরিকল্পনা ডি. ফিল্. পাবার উপযুক্ত। এতে স্তম্ভ তো দূরের কথা প্রাসাদ মানে ভগবান প্রাসাদ পর্যন্ত ধরা দিতে বাধ্য।

সুকুমার কুমার গানের জগতে লায়েক হবার আগে কিছুদিন ল পড়েছিলেন। তার ফলেই নাকি এক ফাদার-ইন্-ল বাগিয়েছিলেন তিনি। সুতরাং ল'পয়েন্টেই বললেন : আমি হলে সোজা ছোকরাকে কিডন্যাপ করে এনে আদালতের ভয় দেখিয়ে কাজ সেরে নিতাম। অবশ্য আমার যদি স্তম্ভের মতো চেহারা থাকতো ! কিন্তু কবি আর গায়কদের তো তা হবার উপায় নেই, আমরা চাঁদ আর ফুলের নির্যাস খেয়েই যে বেঁচে থাকি।

জয়জগন্নাথ সিংহ ক্লাবের নতুন সদস্য। পুলিশের এ. এস. আই.। একে জগন্নাথ, তায় সিংহ, তায় এ. এস. আই.। গলার স্বরও অ্যাসাই। সেই কণ্ঠে বললেন :

—ওসব কুছোনা। দেশ স্বাধীন হোয়াতে হামরা আর আগের মতো পেটাতে পারছে না। তবে হামাদের হাতে গুণ্ডা আদমী আছে। তাদের দিয়ে ধরে এনে আপনার ছালিকা বিবিকা সাথ সাদী দিয়ে দোয়া কুছো কটিন হোবেনা, হাঁ!

হিমকল্যাণ গোঁসাই প্রতিদিনকার মতো দাবা খেলছিলেন। একপাশে। চাল দিতে দিতে বললেন: কেবল একটা বোড়ের জোর দিয়ে দিলেই ঘোড়ার ঘোরারোগ খতম করে দেওয়া যেতো। তাহলেই ঠাণ্ডা হয়ে বসতো, আর এখানে সেখানে বসতো না। আমি তো বলে বলে গজ, মানে হয়রান হয়ে গেছি, তবু তো চাপার মুখে রাজা রাখবেন না?

এমন সময় সুনীল আকাশ চক্রবর্তী মশাই প্রবেশ করলেন। ক্লাবের আকাশে ঝড় তুলে বললেন: চিত্তবিনাশন দাসবাবু, কাকস্য পরিবেদনা।

চিত্তবিমোহন বললেন: চিত্তবিনাশন শব্দ দ্বারা আমার সম্মান হানি ঘটানো হয়েছে। আমার স্ত্রীও কোনদিন ঐ নামে আমাকে সম্বোধন করেন না। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা কথাটির বাংলা করে দেওয়া উচিত।

সুনীল আকাশ চক্রবর্তী বললেন: কাকস্য পরিবেদনা মানে একটি কাক অশ্বের উপর বসিয়া বেদানা খাইতেছে।

'আমরা চমকিত ভাবে বললাম: তার মানে?

—তার মানে অশোকস্তম্ভ কোন অশ্বের উপর বসে বেদানা খাইতেছে। সে মেসে নেই।

—সে কি! কোথায় গেছে সে?

চিত্তবিমোহনের কথা।

—কোথায় গেছে তা বলতে পারলেন না কেউ, তবে আঁচে বুঝলাম ঐ বেদানা খাওয়ার ব্যাপার। আসল কথা মুর্শিদাবাদ থেকে এসেই ডুব দিয়েছে।

সুনীল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলেন।

—কিন্তু ডুবলে তো ভেসে উঠবেই কোথাও। সেই জায়গাটা লক্ষ্য করা দরকার।

ব্যক্ত করেন অব্যক্তশঙ্কর আচার্য।

চিত্তবিমোহন দাস বললেনঃ তাইতো 'ওভার ডোজ' হয়ে গেলো নাকি? কিন্তু আমার শ্যালিকা যে বলেন, লেগে না থাকলে নাকি এ যুগে কিছুটি হবার উপায় নেই। চাকুরী ক্ষেত্রেই বল, আর প্রেমের ক্ষেত্রেই বল, ঐ লেগে থাকতে হবে। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের নাম তখনও নূরজাহান বা জগতের আলো হয় নি। এমন কি প্রাসাদের আলোও নয়—নেহাত মেহের। মেহের উন্নিসা। বাদশাজাদা সেলিম সেই সময় তাকে ভালবেসে ফেললেন। কিন্তু পিতা আকবর শাহ একজন ওমরাহের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করতে পারেন না। তাঁর একটা প্রেস্টিজ্ আছে তো! সুতরাং মেয়ের বিয়ে হলো অন্যখানে। চৌদ্দ বছর স্বামীর ঘর করলো। একটা মেয়েও হলো। এদিকে সেলিম নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু সেই যে মেহেরের ছবিটা বুকের পর্দায় দাগ কেটে বসেছিলো, তা আর মুছে যায় নি। যায়নি বলেই অনেক কারচুপি করে শের আফগানকে তো খতম করালেন। কিন্তু তাতেই কি মন পেলেন মেহেরের! আরও দীর্ঘ চার বছর লেগে থাকার পর সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মেহের উন্নিসা জাহাঙ্গীর বাদশার বেগম হতে রাজী হলেন। ঐ লেগে থাকার জন্যই তো।

কালীপদ নাজির মিত্র মশাই বললেনঃ একশবার একথা সত্যি চিত্তবিমোহন দাসবাবু। আমার মাসতুত ভাইয়ের সাক্ষাৎ খুড়তুত শালার সাক্ষাৎ সম্বন্ধী মশাই পাঁচ পাঁচবার ম্যাট্রিক-স্কুল ফাইন্যালে গাড্ডু খেয়ে বাড়ীতে বসেছিলো। দাদার অন্ন ধ্বংস করে। গালমন্দ খায়। হঠাৎ কিছুদিন ধরে দেখি সেজেগুজে সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় কোথায় যায়। ভাবলাম, নিশ্চয়ই আড্ডা দিতে যায় কোথাও। কোথায়

যায় এ আর দেখতে হবে না। এই রকবাজী করেই তো গোল্লায় গেলো দেশের ভবিষ্যৎ। কিন্তু তখন কি জানতাম হুনলুলু না কামস্কাটকা কোম্পানীর বড়বাবুকে ছাতের টবের হিমসাগর, পুকুরের গঙ্গার ইলিস, আর বাড়ীতে তৈরী বার্মা চুরুট খাইয়ে দেড়শ' টাকার একটা চাকুরী বাগিয়েছে! আজকাল পথে টথে দেখা হলে নাকের উপর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে। শুনছি বড়বাবু সপ্তম কন্যাকে ঐ ছোঁড়ার হাতে দিয়ে কৃতার্থ হতে চান। এসব তো ঐ লাগালাগির ব্যাপারই।

বিমলসুগন্ধি চক্রবর্তী বললেনঃ কিন্তু বেশী লেগে থাকাও যে খারাপ এরও হাজার প্রমাণ আছে। হাতের কাছেই আছে। ছোকরার পেছনে এতো না লাগলে কি আর এমন একজন সদস্যকে হারাতাম আমরা! প্রতিটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দশটি করে টাকা দিতো গো!

কিন্তু এত আলোচনার পরও ডুবুরী অশোকস্তম্ভের ভেসে ওঠার সংবাদ পাওয়া গেলো না।

ফলে আমরা অ্যামেরিকান বা রাশিয়ান না হয়েও দুই শিবিরে বিভক্ত হলাম।

অবশেষে অশোক চন্দের স্তম্ভ দেখা গেলো। রামায়ণের মৈনাক পাহাড়ের মতো ভেসে উঠলো। কিন্তু অনেক দূরে। সেই যে, যে বাড়ীর মাধবীলতা গাছটি দোতলা পর্যন্ত উঠেছে! কলেজ-স্ট্রীটের মেস থেকে শোভাবাজারের দোতলার মাধবীলতার গাছ পর্যন্ত সোজা ডুব নয়। আগের দিন হলে চিৎপুরের খাল দিয়ে না হোক মারহাট্টা ডিচ্ দিয়ে ঢোকা সম্ভব কি না কে জানে! সে সব সুবিধের অভাবে, ডাঙ্গা দিয়েই এসেছে। পাছে কোন গোয়েন্দা অনুসরণ করে এই ভয়ে হ্যারিসন রোড দিয়ে সোজা শিয়ালদা গেল। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে দমদম। দমদম থেকে শ্যামবাজার হয়ে

সরকারী বাসে রাধাবাজার। রাধাবাজার থেকে চিৎপুর। চিৎপুর থেকে অনেক ঘুরে শোভাবাজারের শোভা বৃদ্ধি করেছিলো। অথবা মাধবীলতা আগেই শোভাবর্ধন করে বসেছিলো।

অশোকস্তম্ভ সেই মাধবীতলে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে বীণাবাদিনী বৌদির। সেই বিকেল থেকে। কিন্তু চন্দকে ফ্যাসাদে ফেলবার জন্যই কিনা কে জানে, বীণাবাদিনী বৌদি সেদিনই সেই বিকেল থেকেই বীণা বাজাতে, না না বীণা বাজাতে নয়—বীণা সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে গেছেন। আর মেয়েরা একবার বাড়ী থেকে বেরুবার সুযোগ পেলে কি বাড়ী ফেরার নাম করে (ফেরার হতেই কিনা কে জানে)! সুতরাং বীণাতে সিনেমা দেখে, ফিরপোতে খেয়ে, চৌরঙ্গীতে উল কিনে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে হাওয়া খেয়ে, ভীম নাগের সন্দেশ চেখে, দুই-পাঁচজন পুরনো বান্ধবা গঙ্গাজলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে 'কিছু খাব না ভাই, কিছু খাব না ভাই' বলে এক এক প্লেট 'কিছু' সাবাড় করে রাত দশটা কাবার করে (অশোকস্তম্ভ চন্দকে ডুবিয়ে) খুশী মনে বাসায় ফিরলেন।

ফিরেই দেখলেন শ্রীমান অশোকস্তম্ভ চন্দ তখনও বীণাবাদিনী বৌদির কনিষ্ঠপুত্র ঘণ্টাকুমারকে একের পর এক লজেন্স খাইয়ে চলেছে। ছেলেরা যে আইস্‌ক্রীম্ লজেন্স খেতে ভালবাসে মুর্শিদাবাদ যাবার আগে এমন করে কি জানতো অশোকস্তম্ভ!

কে একজন বলেছিলেন, যখন দেখবে একটি যুবক কোন অনাত্মীয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে যেয়ে সেই বাড়ীর কোন ছেলেকে লজেন্স খাওয়াচ্ছে, কোলে করে আদর করছে, নিজে প্যাণ্টলুন, হ্যাটকোট পরা অবস্থায় ঘোড়া সেজে কোন শ্রীমান ভণ্টুকুমার, নণ্টুকুমারকে পিঠে চড়িয়ে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের রাইচরণ সাজছে—আরও নানাভাবে মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছে, তখনই জানবে সেই বাড়ীতে নির্ঘাত একটি দ্বাদশী ত্রয়োদশী না হোক পঞ্চদশী, অষ্টাদশী

আছেন। আর ঐ সাজা-ঘোড়া যুবকটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষ দুর্বলতা পোষণ করেন। ভল্টুকুমার, নণ্টুকুমার ঐ কিশোরী বা যুবতী কন্যার ক্ষুদে ভ্রাতা।

অবশ্য আমাদের ঘণ্টাকুমারকে বশ করার কারণ ভিন্ন। বীণা-বাদিনীর বীণায় 'ইমনকল্যাণ' রাগ তোলা একমাত্র গোরাচাঁদ বিলাত ফেরতওয়ালারই কর্ম। অন্যে 'ধুন' তুলতে গেলে 'তুলোধুনো' হবার সম্ভাবনা।

যাই হোক সেদিন (রাত্রে) বীণাবাদিনী বৌদির সঙ্গে অশোকস্তম্ভ চন্দের বেশীক্ষণ কথাবার্তা হয়নি। যা হয়েছে, তা অনেকটা এই রকম :

—এই যে ঠাকুরপো ভাই, মুর্শিদাবাদ থেকে কবে ফিরলে? হ্যাঁ, তুমি বীণা সিনেমায় যে বইটে চলছে দেখেছো? ভাল কথা, মুর্শিদাবাদ কেমন লাগলো? যাই বল নায়িকার ভূমিকায় যে মেয়েটি নেমেছিলো, সে বেশ প্রেমালো মেয়ে। হাজার দুয়ারী বেশ দেখতে, না ঠাকুরপো ভাই! হ্যাঁ, সেই সিনেমার মেয়েটি কালো মেয়ে হলে কি হবে ফর্সা ছেলেটাকে আচ্ছা কায়দায় নাকে দড়ি দিলে তো! যাই বল ভাই অশোকস্তম্ভ ঠাকুরপো, বাংলা বইগুলো আজকাল বেশ করছে কিন্তু। তা খোশবাগে গিয়েছিলে তো? নায়কটির বাগানটিও কিন্তু বেশ দেখতে। তোমার দাদা তো বাইরে বদলী হয়েছেন, আমিও শীগগিরই যাবো। সেখানে ঐ রকম একটা বাগান করবো। আচ্ছা ঠাকুরপো স্তম্ভ ভাই, তুমি 'চার বাত্তি তিন রাস্তা' শাড়ী একটা এনে দেবে আমায়, আর নায়িকা যে রকম একটা ঘণ্টা প্যাটার্নের হার গলায় দিয়েছিলো, তেমনি একটা হার! জাহানকোষা কামান দেখেছো ঠাকুরপো ভাই অশোক! তোমার দাদা একটা কিনে দেবেন বলেছেন। না, জাহানকোষা কামান নয়, ঐ নায়িকার মতো ঘণ্টা-প্যাটার্নের হার একটা। কিন্তু কৈ তুমি কিছু বলছো না যে ঠাকুরপো! তোমার তো আবার রাত হয়ে গেলো।

তা রাত হয়ে গেলো। অশোকস্তম্ভ চন্দ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গিয়েছিলো। এক সময় ছুটো একটা কথা বলে, সেদিনের মতো উঠে গিয়েছিলো। না, সেদিন আর কোন কাজের কথা হয়নি।

অবশ্য, প্রথম দিনেই কাজের কথা বলা ঠিকও নয়। অশোকস্তম্ভ চন্দের এক বন্ধু গঙ্গাধর গাইন মশাই বলতেন, কারো কাছ থেকে কোন কাজ বাগাতে হলে প্রথম কয়েকদিন এমনি সেমনি যেতে হয়। প্রথমেই কাজের কথা বলতে নেই।

গঙ্গাধর গাইন একজন মহাজন ব্যক্তি। বড়বাজাবে তার কাপড়ের দোকান। সুতরাং মহাজন ব্যক্তির কথা অনুসারে অশোকস্তম্ভ আরও হু'তিন দিন এমনি সেমনি বীণাবাদিনী বৌদির সঙ্গে দেখা করেছিলো। কোন দিন ঘণ্টা প্যাটার্নের হার, কোনদিন 'মন ছিনতাই শাড়ী'র গল্প শুনেছিলো। মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হুঁ হুঁ' বলেছিলো। কিন্তু কাজেব কথা বলার সুযোগ পাযনি। আব মহিলারা বাঁধ আটকানো বন্যা বিশেষ! একবাব বাঁধ খুলে দিলে আর রক্ষে নেই। সে গঙ্গা-স্রোত থামানো শিবেবও অসাধ্য। তবু যে পুরুষেরা তাদের কথা শোনেন সে কেবল পুরুষদের অপূর্ব ক্ষমাগুণ এবং সহিষ্ণুতা। এ ব্যাপারে পুরুষদের চামড়া আর গণ্ডারের চামড়া নাকি কাছাকাছি।

অবশেষে একদিন।

—যাই বলুন বৌদি ভাই, কালো মেয়েদের মতো মেয়ে আর হয় না। কালো মেয়েদেরই তো কৃষ্ণকলি বলা হয়।

বীণাবাদিনী বৌদি কালো। কে জানে তাঁর মন রাখার জন্যই একথা বলেছিলো কি না অশোকস্তম্ভ। আর সে কথা শুনে (হাজার হলেও একটা স্কলার বলছে) বীণাবাদিনী বৌদি বলেন: কী যে বলো অশোকস্তম্ভ ঠাকুরপো ভাই!

—সত্যি বৌদি। আগে আমার ধারণা ছিলো ফর্সা মেয়েরা বোধহয় ভালো হয়। মনটা বুঝি তাদের ফর্সাই হয় স্টীম লণ্ড্রীর ধোয়া কাপড়ের মতো। কিন্তু না! ফর্সা মেয়েদের মতো বিতিকিচ্ছিরী মেয়ে তুমি ভূ-ভারতে পাবে না। আল্পস্ পর্বতেও না। এই যে বিদঘুটে মেয়েরা, এরা মোটেই সন্দেশের মতো নয়। ঘুঁটের মতো। শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

বীণাবাদিনী বৌদি একটা সন্দেশ মুখে দিতে দিতে বলেন: কী যে বল স্তম্ভাশোক ঠাকুরপো ভাই!

এবারকার কণ্ঠটি অপেক্ষাকৃত বিগলিত। একটু গদগদও।

অশোকস্তম্ভ সেদিকে লক্ষ্য করে বলে: রূপের দেমাকেই তারা মারা পড়ে আর কি! ধরাকে সরা-ই ভাবে। সরাইখানাও ভাবে বলতে পারো। ফলে, আজ এ সরাইখানায়, কাল ও-সরাইখানায় ঘোরে। আর কালো মেয়ের কথা মনে হলেই মনে হয় দ্রৌপদীর কথা। কী রান্নাই না ভদ্রমহিলা রাঁধতেন। মনটাও কত ভালো দেখ।

অশোকস্তম্ভ কালোর রূপ বর্ণনায় মুখর হয়ে ওঠে।

এদিকে বীণাবাদিনী বৌদির দৃষ্টিও ধীরে ধীরে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হতে থাকে। হ্যাঁ, বেশ একটু আশ্চর্যকর মনে হচ্ছে যেন। অশোক-স্তম্ভ যদিও ভূত নয়, আর রাম নামও অবশ্য করছে না, কিন্তু রামাদের সম্পর্কে ও-মুখকে এতো মুখর হতে তো দেখা যায় নি। মেয়ে—বিশেষ করে কালো মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া এমন একজন কালাপাহাড়ের পক্ষে আশ্চর্য বৈকি! আর এত ঘন ঘন এ বাসায়ও আসতে দেখা যায় নি যাকে।

কথায় বলে মেয়েদের মন, না রাডার যন্ত্র। সেই রাডারকে ফাঁকী দিতে পারে এমন বৈমানিক নেই। কোন্ বিমান কোথায় ল্যাণ্ড করবে, কোন্ বিমান (?) কোন্ দিক দিয়ে আসবে এটা বোঝা মেয়েদের পক্ষে এক মিলিগ্রাম অসুবিধা হবার কথা নয়। অসুবিধা নয় গ্রাম কিলোগ্রামে ভাঙিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে।

আর বিবাহিতা মেয়ে তো এক একজন ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বিশেষ। তাঁদের ফাঁকী দিতে পারে এমন অকেশন্যাল, প্রোফেশন্যাল ক্রিমিনাল (?) পৃথিবীতে নেই। জার্মানীর গেস্টাপো, আমেরিকার এফ. বি. আই., ইংলণ্ডের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ঝানু পুলিশ কর্মচারীদের চোখে ধুলো দেওয়া যদিও সম্ভব, কিন্তু বিবাহিতা মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। কপালের ঐ সিঁদুর চিহ্ন একটি চূড়ান্ত রেড্ সিগন্যাল। তাকে ফাঁকী দিয়ে কোন গাড়ী বেরিয়ে যাবে, হেন সাধ্য নাহি হেথা কারো।

তার ফলে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে অশোকস্তম্ভের মনের গভীর তলাকার পাঁক ঘেঁটে ছোট বড় বহু মৎস্য বের করে ফেললেন বীণাবাদিনী বৌদি। ট্রেনের ঘটনা থেকে হাজার-তুয়ারীর বোষ্টম পর্যন্ত। কালো মেয়ের প্রশংসার ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাস থেকে মুর্শিদাবাদের ভূগোল পর্যন্ত। কালো দ্রৌপদীর গুণপণা থেকে কালো হিমালয় নির্ঝরিণীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কিছুই বাদ গেলো না।

সব বলে শ্রীমান অশোকস্তম্ভ রাখেন-ইচ্ছা-রাখবেন-বীণাবাদিনী বৌদির সামনে হাড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দিলো, যেন হুবহু বলির পাঁঠার মতো। আর বীণাবাদিনী বৌদি যেন খড়্গখানা হাতে নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে ধার পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। না, সে খড়্গখানা আর গলায় বসালেন না বীণাবাদিনী বৌদি। রসনা-খড়্গ রসান দিয়েই সংযত করলেন।

মেয়েদের একটা গুণ হচ্ছে, তাঁদের কাছে কেউ শরণাগত হলে তাঁরা শিবি রাজা হয়ে যান। পুরাণের সেই মাকালীর কাছ থেকেই তাঁদের এই 'মাভৈ' মন্ত্র শেখা।

ধরুন, আপনি পাঁচশো টাকা রোজগার করেন, অথচ কিছুতেই সংসার ম্যানেজ করতে পারছেন না। ধোপা, নাপিত, গয়লা, মুদি ঠেকাতে ডেভিড্ কপারফিল্ড উপন্যাসের মিঃ মিকভার সাজতে হচ্ছে (জানেন নিশ্চয়ই মিঃ মিকভার পাওনাদার এলেই নিজের গলায় ক্ষুর

বসাতে যেতেন, আর পাওনাদার পাওনা আদায় করবে কি—খুনের দায় থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বাঁচতো)। প্রতিমাসেই এক আধশ' টাকা চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে অফিসের দারোয়ানের কাছে, নয়তো কাবুলিওয়ালার কাছে ঋণ করতে হচ্ছে চড়া সুদে।

বাড়ীর গৃহিণীর শরণাপন্ন হোন। মাসের প্য়লা তারিখে পাঁচশো টাকা (একশ টাকা হলেও ক্ষতি নেই কম রোজগেরেদের) দিয়ে দিন শ্রীকরকমলে। স্ত্রীকরকমলেই আসলে। তারপর নাকে তেল দিয়ে অফিস করুন—খাঁটি সর্ষের তেল নয়, বাজারে যে সর্ষের তেল পাওয়া যায়, নইলে জ্বালা করবে।

গয়লা, মুদি, ধোপা, নাপিত মায় সপ্তাহে তিনটে করে সিনেমা, রোজ এক প্যাকেট উইলস্ সিগারেট (একশ' টাকা রোজগার-ওয়ালাদের এক প্যাকেট বিড়ি) জুটবে! চাই কি প্রতি তিনমাসে একছড়া হার—নিদেনপক্ষে একজোড়া কানপাশা ঐ টাকার মধ্য থেকে হবে। মেয়েরা যে কী করে টাকা জমায়, তা আমি অধম লেখক তো দূরের কথা, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ পর্যন্ত জানেন না।

শুধু কি তাই, খুন করে কেউ স্ত্রীর শরণাপন্ন হলে, তার বেকসুর খালাস স্ত্রীর আদালতে। আমাদের এক মনস্তত্ত্ববিদ্ বন্ধু বলতেন, বিবাহিত জীবনে অন্য মেয়ের সঙ্গে বেতাল বেচাল ব্যবহার করেও স্ত্রীর ক্ষমা পাওয়া যায়, যদি কেউ স্ত্রীর কাছে অপরাধ স্বীকার করে। আসলে মহিলামাত্রেই পরম কৌতূহলী। তাদের জ্ঞাতসারে যা কর সব মানাবে, কিন্তু তাদের লুকিয়ে ছাপিয়ে কিছু করতে গেছ কি মরেছ।

আমাদের অশোকস্তম্ভ চন্দ স্ত্রী-চরিত্রের এই মনস্তত্ত্ব জানতো কিনা ঠিক জানিনে। বীণাবাদিনী বৌদি সহাস্যে অভয় দিলেন তাকে।

অবশ্য অভয় দেবার আগে চিত্ত জ্বালানো কথা বলে বেচারা অশোকস্তম্ভকে কোণঠাসা করে নিলেন। এমন কি অশোক চন্দ যে কোনদিন বেতাল বেচাল চলবে না, এবং চিরকাল 'দেহি পদপল্লব মুদারম্' করে থাকবে হিমালয় নির্ঝরিণীর কাছে, এ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি

দিতে হলো। এক কথায় বীণাবাদিনী বৌদিকে জয় করতে এসে শ্রীমান অশোকস্তম্ভ চন্দ সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে গেল। কিন্তু সে পরাজয়েয় মধ্যে যে এত আনন্দ, আসামী হয়েও যে এমন দুর্লভ স্বামীত্ব লাভের সাফল্য, তা কেবল অশোকস্তম্ভ চন্দেরাই জানে।

আর ইস্তিরীরা তো চিরকালই বিজয়িনী। জয় করে করেই তো তাদের অ্যাত 'joy'।

এর পরের দৃশ্য হিমালয়ে মানে হিমালয় নির্ঝরিণীদের বাড়ীতে। দৃশ্যপট উত্তোলিত হওয়ার পরই বীণাবাদিনী বৌদিকে বাজাতে দেখা গিয়েছিলো। বীণা না বাজিয়ে তিনি তাঁর মাতুল শ্রীযুক্ত কৃতান্তদমন বাবুকে বাজিয়ে দেখছিলেন। অশোকস্তম্ভকে হিমালয় অঞ্চলে প্রোথিত করার ভূমিকাই করছিলেন তিনি।

বলছিলেন, পাত্র এবং ছাত্র হিসেবে ঠাকুরপোর মত পাওয়া যাবে না মামা! এমন জামাই, জামা ছাড়াই যার বুকের পাটা চল্লিশ ইঞ্চি—এ কেবল তোমারই উপযুক্ত। তোমাদের জামাই তো সে তুলনায় কেবল জামা-ই। নস্যও বলতে পারো মামা।

বীণাবাদিনী এই সুযোগে আপন স্বামীকে নস্যাৎই করেন।

এককালের খ্যাতনামা স্পোর্টসম্যান কৃতান্তদমন ভাগ্নীকে দমিয়ে দিয়ে বলেন, কিন্তু এখনই বিয়ে দিতে বলিস মা। ছেলেটিও পড়ছে বলছিস, এদিকে মেয়েটাও পড়ছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা আবার বেশী ওয়েট সহ্য করতে পারে না। পরীক্ষার মুখে এ রকম হেভী-ওয়েট সামলাতে পারবে তো!

বীণাবাদিণী বৌদি বলেছিলেন, কী যে বল মামা, হেভী-ওয়েট না ছাই, লাইট-হেভী-ওয়েট বলেই মনে করে সব ছেলেমেয়েরা বিয়েকে। স্পোর্টস্ বলেই ধরে নেয়। ম্যারাথন রেস্‌ও নয়, বড়জোর একশ মিটারের দৌড়। রেজিস্ট্রি অফিসে যেয়ে সই করার অপেক্ষা।

কৃতান্তদমন বলেছিলেন তা মেয়ের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম মা। সেটা না হয় 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' বলেই ধরে নিলাম কিন্তু ছেলে? ছেলের বাপ মা, তাদের সঙ্গে আবার 'টাগ অব ওয়ার' করতে হবে না তো! ছেলেই কি মত দেবে ভাবছিস! অমন সৎ ছেলে, অমন পড়াশোনায় ভাল ছেলে যখন। হাই জাম্পে অতটা যেতে পারবি কি তুই মা?

বীণাবাদিনী বৌদি হাসি গোপন করে বলেছিলেন, ঠাকুরপোর জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না মামা। আমার কথায় সে 'ব্রডজাম্পে' পঁচিশ ফুট লাফাতে পারে। বলতে গেলে সে আমার লক্ষ্মণ দেবর। অবশ্য লক্ষ্মণ কোনদিন 'ব্রডজাম্প' দিয়েছে কিনা আমি জানিনে। সেজন্য তুমি কিছু ভেবো না মামা।

তা ভাবেননি কৃতান্তদমন। কয়েকদিন বাদেই কোলকাতা এসে শ্রীমান অশোকস্তম্ভকে সরাসরি বলেছিলেন, হীট নয় একবারেই ফাইন্যাল করে দেবো বাবা। তিন দিনও নয়, দুদিনেই। বিয়ে, বাসি বিয়ে ব্যস্। তারপর যত পড়াশোনা করতে চাও পরীক্ষা পর্যন্ত করো। চাইকি এক মিনিট সাঁতরে পরীক্ষার-পড়া-রূপ হেদো পার হও, সে তোমার মতো যোগ্য ছেলের ব্যাপার। আমি যেটুকু তোমাকে সাহায্য করতে পারি ওয়েটলিফটিং-এ, তা হচ্ছে নির্ঝরকে এই ক'মাস আমার বাড়ীতে রেখে, তোমার ঝামেলা কমিয়ে।

শেষের কথাগুলো যদিও কুইনিনের মতো তেতো, তবু মুখ বুজে গিলতে হলো বৈকি। চোর আর স্বামীদের রাত্রিবাসই নাকি লাভ। সেই রাতকেই নাকি বরাতের বিড়ম্বনায় বিসর্জন দিতে হবে!

অশোকস্তম্ভ মুখে বলেছিলো, ইয়ে, তা, তা, মানে এ সম্পর্কে গুরুজন ব্যক্তিরা, মানে ইয়ে, যা ভাল বুঝবেন—।

কৃতান্তদমন অনেক কষ্টে হাসি দমন করে বললেন, সে তোমায় ভাবতে হবে না বাবাজী। আমি কালই তোমার বাবার কাছে অনুরোধ জানাতে যাচ্ছি।

মনে মনে ভাবলেন, আজকালকার ছোকরাগুলো প্রথম রাউণ্ডেই এমন করে নক-আউট হয় জানতুম না। মিছেই ভেবেছিলাম, ছোকরাকে সম্মত করাতে না জানি কত রাউণ্ড লড়তে হবে।

সেইদিনই বীণাবাদিনী বৌদি হিমালয়কে নাগালে পেয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁরে, অমন ভীষ্মকে বাগালি কী করে রে মুখপুড়ি, অ্যাঁ! কায়দাটা প্যাটেণ্ট করে বাজারে ছেড়ে দে, হু হু করে বিক্রী হয়ে যাবে।

হিমালয় নির্ঝরিণী বীণাবাদিনী দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, কী যে বল দিদি, ভীষ্ম না ছাই। অর্জুন, অর্জুন সব। যাদবদের বাড়ী যেযে সুভদ্রার হাতে ঘায়েল হলো। মণিপুরে চিত্রাঙ্গদা, এমন কি সন্ন্যেসী অবস্থায় নাগকন্যা উলুপীতে পর্যন্ত বাধলো না।

বীণাবাদিনী বললে, তুই তাহলে কোনটারে? উলুপী, না সুভদ্রা! নাকি শূর্পণখা! আমার অমন লক্ষ্মণ দেবব পর্যন্ত বশ মানলো!

হিমালয় বললেন, লক্ষ্মণেব কথা আব বলো না দিদি। একটা ব্রুট্। নইলে শূর্পণখার প্রেম প্রত্যাখ্যান কবে? তুমি ভেবো না, আমি কী, তোমার লক্ষ্মণ দেবরকে দুদিনেই বুঝিয়ে দোব। কিন্তু যাই বলো দিদিভাই, ছোকরার চেহারাটা গুণ্ডার মতো হলে কি হবে, মনটা শিশুর মতো নরম। ইচ্ছে কবে বিযেব আগেই একদিন নিমন্ত্রণ খাইয়ে দি। পোলাও কালিয়ার দবকাব কি, একটু আদব খাইয়ে দিলেই চলবে।

বীণাবাদিনী বৌদি কৃত্রিম ধমকের সুরে বললেন, মুখপুড়ি একদিনেই কি বাচাল হয়ে উঠেছে ছাখো। গুরুজন বলে আর মান্যি গন্যি নেই। কিন্তু দেখিস্, বেশী লাই দিসনে যেন।

হিমালয় নির্ঝরিণী বললেন, পাগল হয়েছো দিদিভাই, কুকুর আর পুরুষ মানুষকে লাই দিতে আছে! দিলেই মাথায় চড়ে বসবে না! শেষে কি তোমার মতো বিলেত থেকে ধরে আনতে যাবো। আমার বাবার এত টাকা আছে নাকি?

এর ক'দিন পরই অশোকস্তম্ভ-হিমালয় নির্ঝরিণীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো। সানাই বেজেছিলো, শাঁখ বেজেছিলো। শুভদৃষ্টির সময় ঘোমটার আড়ালে হিমালয় নির্ঝরিণী লোকচক্ষু বাঁচিয়ে জিভ্ বের করে অশোকস্তম্ভকে ভেংচি কেটেছিলো। অবশ্য তার আগে, 'তদিদং হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং তব' মন্ত্রপাঠের সময় শ্রীমান সৎ ছেলে অশোকস্তম্ভ তার হাতের উপর রাখা হিমালয় নির্ঝরিণীর হাতে চিমটি কেটে দিয়েছিলো।

এদের এই সব কাণ্ডকারখানা কেউ দেখেছিলো কি না, দেখলেও কেউ কিছু বলেছিলো কি না আমরা জানিনে।

শুধু বিয়ের রাত্রে বর্ধমানের সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা মাসীমা একগাল হেসে মেসোকে চাপা স্বরে বলেছিলেন, না, মেয়েটার বুদ্ধি সম্পর্কে আমি ভুল ধারণাই করেছিলাম। বোষ্টম না চোরটাকে ঠিকই হাতে নাতে ধরে ফেললো তো! এরকম চোর পেলে যে কোন মেয়েই ধরতে চাইবে। তা যাই বলো, কার বোনঝি সেটা দেখতে হবে তো! কালকে সাবধান করে দোব, এরকম চোরকে যেন পুলিশের হাতে ছেড়ে না দেয়। পুলিশের মধ্যে আবার আজকাল নাকি মেয়ে পুলিশ আছে। এ রকম চোর পেলে তারাও ছাড়বে বলে মনে হয় না।

বর্ধমান মেসো, ততোধিক চাপা স্বরে বলেছিলেন, আঃ, কী যে তুমি জোরে জোরে বল কাঞ্চু, এসব কথা দেওয়ালেরও শোনা উচিত নয়। জান তো অনেকে বলে, দেয়ালেরও নাকি কান আছে। কোথায় আছে অবশ্য তা আমি জানি নে। আর—

মাসীমা সঙ্গে সঙ্গে পাদপূরণ করেন, আর দেয়ালদেরও চরিত্র গঠনে অসুবিধে হতে পারে।

উভয়ে আচমকা হেসে উঠেই কী ভেবে চুপ করে গিয়েছিলেন।

বিয়ের একদিন পরই ফুলশয্যা। ফুলশয্যার দিন বর-কনের বিছানা নাকি ফুল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়! সেই শয্যায় শুয়ে যে

কি আরাম ভগবান জানে! গায়ের চাপে, ফুল চটকে গেলে জামা-কাপড়ের যে বাবোটা বেজে যায়, তা বোধহয় জামাইরা খেয়াল করে না। খেয়াল গানের সময় অন্যদিকে খেয়াল থাকে!

ফুলশয্যাব দিন অশোকস্তম্ভ ঘরে ঢুকেছিলো। হিমালয়কে হাতে ধরে কে একজন যেন ফুলশয্যার ঘরে দিয়ে গেলো। এই রকমটাই পৌঁছে দেবাব নিয়ম। ঐ সঙ্গে সেই সুরসিকা বৌদি জাতীয়ারা বলেন, এই যে ভাই যার জিনিস তাঁব হাতে পৌঁছে দিয়ে গেলুম।

আর একটু যাঁবা ইযে গোছেব, তাবা বলেন, যেমনটা দিযে গেলুম, কাল যেন তেমনটিই ফেরত দিও ভাই—ইত্যাদি।

হিমালয় ঘবে ঢুকেই দরজা বন্ধ কবে দিয়েছিলো। তাবপর ঘোমটা সরিয়ে পবিপূর্ণ দৃষ্টিতে অশোকস্তম্ভেব দিকে তাকিয়ে বলেছিলো: এই ঠাকুবপো!

ঠাকুবপো! অ্যাঁ, ঠাকুবপো আবাব কে? অশোকস্তম্ভ চন্দ কি ঠাকুরপো। প্রতিবাদ কবে বলে: ঠাকুবপো মানে। তুমি কি বিযের পর কাকে কী বলতে হয় তাও শিখে নাওনি গা।

—কই আব সময় পেলাম। বলনা গো, শ্বশুবেব ছেলেকে কী বলে?

—আর্যপুত্র।

—হুঁঃ, ভারি আমার আর্যপুত্রবে। যেন আর্যধাবার মূর্তিমান অবতার আমার। আর্যপুত্র আব ঠাকুরপোতে পার্থক্য কি মশাই? আর্য মানে শ্বশুর—ঠাকুর মানেও শ্বশুর। কাজেই কোন্ কিতাবে লেখা আছে শ্বশুবেব ছেলেকে ঠাকুবপো বললে দোষ আছে?

—আহা, আক্ষরিক অর্থে নেই, কিন্তু প্রয়োগগত অর্থে, ব্যবহারিক অর্থে স্বামীকে ঠাকুরপো বলা যায় না, যদিও ঠাকুরপো অর্থ শ্বশুরের ছেলে।

—তাহলে তো 'হউরের পো' বলা যায়! বাঙাল ভাষায় শ্বশুরকে তো 'হউর' বলে।

—তুমি তো সাংঘাতিক মেয়ে, সব্বনেশে মেয়েই তো তুমি। ফুলশয্যার রাতে কত মিঠি মিঠি বাত বলে, তা নয় ভাষাতত্ত্বের কচকচি!

—আহা-হা এ-তো ভাষাতত্ত্বই। ভালবাসা তত্ত্বই তো। বেশ, তোমাকে না হয়, ওগো, হ্যাঁগো বলেই ডাকবো। পরে অবশ্য মিনসে, হাড়হাবাতে বলাই নাকি রেওয়াজ।

অশোকস্তম্ভ হিমালয়ের প্রতি অপাঙ্গ ইঙ্গিৎ করে বলে: হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেওয়াজ করতে করতেই তো গলা খোলে। খোল করতাল ছাড়াই খোলে। যাক্ সেকথা, ফুলশয্যার রাত্রে নাকি শুধু চাঁদ আর ফুল নিয়েই মিষ্টি মিষ্টি মধু মধু কথা বলতে হয়। মিষ্টি খাওয়াতে হয়। নাও, কাছে এসো, একটু মিষ্টি খাইয়ে দেই।

[illegible] না, অশোকস্তম্ভ মিষ্টিমুখেই এগোয়। হাতে না নিয়ে মুখে করেই এগোয। এগোতে এগোতে লজ্জায় লাল হওয়া হিমালয়ের দিকে তাকায়। বিপজ্জনক এলাকায় পৌঁছুবার ঠিক পূর্বমুহূর্তেই হঠাৎ বাইরে দরজার পাশে—জানালার পাশে—কাঁকনের রিনিঝিনি, কাক-কোকিলের ফিস্‌ফিস্ ধ্বনি শোনা যায়।

সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ততোধিক ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠে বলে ওঠে হিমালয় নির্ঝরিণী, এই শুনছো!

অশোকস্তম্ভও শুনেছিলো, শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো: হ্যাঁ যা বলছিলাম, বৈষ্ণব দর্শনকে আমরা চারভাগে ভাগ করতে পারি—বুঝলে। বৈদিক যুগে যে দর্শন তা প্রধানত ভক্তি কেন্দ্রিক। ভক্তি দ্বারাই মুক্তির কথা। ঈশ্বর উপলব্ধির সাগরে ভক্তিতরণীই একমাত্র পারাপার ব্যবস্থা। ঐ সঙ্গে বলি, অদ্বৈত-বাদের কথা।

এরপর বাইরে শাড়ীর খস্‌খস্ চুড়ির রিনঝিন থেমে গিয়েছিলো। আড়িদায়িনীরা যার যার ঘরে যেয়েই থেমে ছিলো। ওরে বাপস্, কোথায় ফুলশয্যার রাত্রে একে অন্যকে দর্শন করে রাত

কাটাবে তা নয় কিনা বৈষ্ণব দর্শন ! তাতেও শেষ নয়, এর পর কিনা অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়। অ্যাঁ, এ কেমন জামাই গো, কোন কিছুই বাদ দেয় না। না হয় ভাল ছাত্রই। কিন্তু পাত্র হিসেবে এসে, একি পরকালের হিসেব নিকেশ। ছি, ছি এর পর আর আড়ি পেতে সুখ আছে !

এর পরের দৃশ্য অবশ্য বৈষ্ণব কবিতাই। কোন সময়, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ, তবু হিয়া জুড়ন না গেলো', আবার কোন সময়, 'রূপলাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মনভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।'

তারও পরে সেই জ্যোছনা পুলকিত যামিনীতে, কোকিল বঁধুর গান শুনতে শুনতে, অশোকস্তম্ভের কোলে মাথা রেখে, তার গলা আঁকড়ে, গান ধরেছিলো হিমালয় নির্ঝরিণী। অশোকস্তম্ভের বিহ্বল অনুরোধেই :

এই মধুময় রাত কাটে তারা গোনাতে,
মোরা রেখেছি কোকিল বঁধু গান শোনাতে।
সোনার প্রদীপ কেবা জ্বালে আর
দূরে ঐ তারাদের অভিসার
আহা, চাঁদের রয়েছে আলো, ভরা সোনাতে।
মোরা রেখেছি কোকিল বঁধু গান শোনাতে।

এক সময় গান শেষ হয়েছিলো। তার পরেও অনেকক্ষণ দুজনে জেগেছিলো। অনেক হৃদয়বিদারক কথাবার্তা বলেছিলো।

অশোকস্তম্ভ বলেছিলো : জীবনে যত জয়ই করেছি, হিমালয় জয় সব থেকে সার্থকতম।

হিমালয় বলেছিলো : আমিও কিন্তু একটা জয় করেছি।

—অ্যাঁ, আমি তো যুদ্ধের আগেই শ্বেতপতাকা উত্তোলন করেছি গো, তুমি আবার কী জয় করলে ?

—উজবুকিস্তান বলে একটা জায়গা।

—উজবুকিস্তান আবার কোথায়, অবশ্য উজবেকিস্তান বলে একটা জায়গা আছে। সারা বছর বরফ পড়ে থাকে।

—সে বরফ আমি গলাব। হৃদয়ের উত্তাপ দিয়েই গলাব। তারপর ফলে ফুলে মনের মতো করে গড়ে তুলবো দেখো। জান তো মেয়েরা বাঁদরকে পর্যন্ত শিব গড়তে পারে। মেয়েরা পারেনা কী, তাই বলো! বল না গো। এমন কি, এমন কি, আজকাল ছেলে পর্যন্ত হতে পারে। এদিকে ওদিকে শোনা যাচ্ছে নাকি মশাই।

তিনদিনের মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছিলেন শ্বশুরমশায়। অশোকস্তম্ভের শ্বশুরমশায়। কিন্তু সত্যই কি ছাড়া পেয়েছিলো অশোকস্তম্ভ চন্দ? লাটাই হাতে রাখা ঘুড়ির মতই ছাড়া আর কি। আমহার্স্ট স্ট্রীটের হোস্টেল থেকে শোভাবাজারের কোনালকান্তি কোদক লেনের সতেরোর এক নম্বর বাড়ী। না, বীণাবাদিনী বৌদিদের বাসা আর হিমালয় নির্ঝরিণীদের বাসা এক নয়। তার থেকে খান দশেক বাড়ী দূরে আর এক বিখ্যাত গলিতে। কোলকাতায় গলিতে গলিতেই যা গলাগলি। বাকী সব গালাগালিতে পূর্ণ। রামসুন্দর পাত্রনবীশ, শ্যামসুন্দর তলাপাত্রের শ্রাদ্ধ না করে, অন্ন গ্রহণ করেন না। মুখুজ্যেদের সঙ্গে বাঁড়ুয্যেদের বাড়াবাড়িতে কাকপক্ষীটি পর্যন্ত বসতে পারে না।

সেই আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে শোভাবাজারের গলিতে গলাগলি করতে আসতো অশোকস্তম্ভ। চুরি করেই আসতো।

হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট গজপতি সামন্ত হোস্টেল সীমান্তের রক্ষক। তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটা মাছিও রাত দশটার পর হোস্টেল থেকে বেরুতে বা হোস্টেলে ঢুকতে পারে না। চোর-টোর তো নয়ই। নতুন স্বামীরা চোর ছাড়া আর কি? আসামী বলতে তো স্বামীদেরই নাকি বোঝায়।

চোর আর স্বামীদের রাত্রিবাসই নাকি লাভ।

কিন্তু কথায় বলে, দশদিন চোরের একদিন গজপতি সামন্তের। সেই একদিন, চোরকে হাতে নাতে ধরে ফেললেন—ধরে ফেললেন অশোকস্তম্ভকে।

—এত রাত্রে কোত্থেকে আসা হলো!

সীমান্তরক্ষীর কণ্ঠেই প্রশ্ন করেন গজপতি। আর সেই সঙ্গীনের দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গেলে অশোকস্তম্ভ।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই কি সত্য কথা জানান যায়! জানান যায় কি, রাত সাড়ে ছ'টার শো'য়ে রঙমহলে সুনীল চক্রবর্তীর 'টাকার রং কালো' নাটক দেখে সুনীল চক্রবর্তীর পয়সায় রঙমহল কেবিনে এটা সেটা সাটিয়ে (আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না) তার বইয়ের বিতিকিচ্ছিরী প্রশংসা-নিন্দে করে, আরও দু'-তিন ঘণ্টা হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভ্রমণ করে, হোস্টেলে ফিরেছিলো অশোকস্তম্ভ।

হতভাগা দারোয়ানটা এর জন্য প্রতিদিন দু' টাকা করে ঘুষ নিয়েও নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর তারই পরিণামে রাত্রি দ্বিপ্রহরে বলিদানের পূর্বমুহূর্তে কম্পমান অজসদৃশ অশোকস্তম্ভ।

তবু উত্তর দিতেই হয়। কারণ উত্তর না দিয়ে পার নেই গজপতির কাছে। উত্তর দক্ষিণ সব দিকেই সাঁতরে পার হওয়া অসম্ভব।

বলতে হয়ঃ আজ্ঞে, আমার এক বন্ধুর ইয়ে—মানে কলেরা। কলের জল খেয়ে নয়, অন্য কী খেয়েই যেন। তাকেই দেখতে গিয়েছিলুম স্যর।

গজপতি সামন্ত যেন কী ভাবেন। তারপর বলেনঃ হুঁ, আজকাল কলেরা একমাসেও একজন রোগীকে ছাড়ে না দেখছি। তা আর কদ্দিন ঐ পুরনো রোগী নিয়ে থাকবে মাস্টার চন্দ। একটা নতুন কেস ধর।

—ইয়ে, মানে নতুন কেস্! তা স্যর ইয়ে—।

অশোকস্তম্ভ বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত হারিয়ে ফেলে ঐখানেই ইতি দিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে।

গজপতি সামন্ত অবশ্য চেপে গিয়েছেন, দিন দুই আগে হোস্টেলের পেছন দিকের পাইপ বেয়ে শ্রীমান অশোকস্তম্ভ যখন হোস্টেলে ঢুকছিলো, গজপত্নী দনুজমর্দিনী সামন্ত তা দেখেছিলেন। দেখে যথাসময়ে সীমান্তরক্ষীর কানে দিয়েছিলেন। গজপতি চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে তা নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। স্তম্ভ চিনতে তাঁর মোটেই দেরী হয়নি। শ্বশুরবাড়ীতে যাবার কারুকার্য সমেতই দেখেছিলেন। হিমালয় নির্ঝরিণীর দেওয়া রজনীগন্ধার মালাটা পর্যন্ত তখনও গলায় ঝুলছিলো। ঝুলনরত অশোকস্তম্ভের গলায়।

এর পরের সাতদিন হোস্টেল থেকে বেরুবার কথা চিন্তা করতেও পারেনি অশোকস্তম্ভ। কিন্তু কথায় বলে, গাই বাছুরে মিল থাকলে নাকি কী হয়!

নইলে ক'দিন পরে সুদূর টালিগঞ্জের এঁদো মাঠে স্তম্ভদম্পতিকে গুঞ্জনরত অবস্থায় দেখা যাবে কেন? আর সেখান থেকে ভিন্ন পথে ভিন্ন সময়ে শ্বশুর বাড়ীতে এসে প্রবেশই বা করবে কেন!

—কি দাদাভাই, হোস্টেল ছেড়ে রাত্তির বেলা এখানে যে? হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।

দিদি—শাশুড়ীই হরিনামের মালা জপতে জপতে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

এ ভয় অশোকস্তম্ভেরও যে না ছিলো তা নয়। লঙ্কায় অনুপ্রবেশ করতে গেলে চামুণ্ডাকে এড়াবার উপায় নেই।

—আজ্ঞে, পরীক্ষা সামনে কিনা তাই।

জাঁদরেল দিদিশাশুড়ীর চেয়ে গজপতির গজদন্ত অনেক মনোরম।

—পরীক্ষা সামনে বলে বুঝি হিমুর কাছে পড়তে এসেচো। তা বেশ দাদাভাই। আমাদের নির্ঝরিণী দিদিভাই বেশ পড়াতে পারে। পিত্তি জ্বালানো হাসি দিয়ে কথা বলেন দিদিশাশুড়ী: তা দাদাভাই হিমালয় নাকি এযুগে অনড় নয়। কোথায় কোন বন্ধুর বাড়ীতে নড়ে

চড়ে বেড়াচ্ছে স্থাখোগে। বিয়ের পর থেকেই তো তার বাইরে বেরুবার মাত্রা বেড়েছে, আফিং-এর মাত্রার মতোই।

—ওঃ, হিমু বুঝি বাসায় নেই, কিন্তু আমি যে একটা 'ইম্পরট্যান্ট নোটস্' এর খাতা নিতে এসেছিলাম দিদিমা। দরকারী জিনিস বাক্সেই রেখেছে নিশ্চয়ই। আমতা আমতা করে বলে অশোক চন্দ।

—ওঃ, তাও আবার বাক্সে। বাইরে নয় যে আমরা পোড়াচোখে একটু খুঁজে পেতে দেখবো। তাও আবার এমন দিনে এসেচে নাতজামাই, যে দিন মেয়েটা কোন বন্ধুকে নিয়ে নাকি সিনেমা, না থিয়েটার দেখতে গেছে। আর এখন কিনা পড়ুয়া নাতজামাইকে শ্বশুর বাড়ীতে অপেক্ষা করতে হয়। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ।

মালা টপকাতে টপকাতে ঠু'কাজই করছিলেন দিদিশাশুড়ী।

—আজ্ঞে খুবই মুশকিলে পড়া গেলো আর কি!

অশোকস্তম্ভ যথা সম্ভব মুশকিলে পড়ার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলেছিলো।

—সে তো বটেই, সে তো বটেই, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। আজে বাজে নোটবই হলেও না হয় কথা ছিলো। এযে আবার ইম্পটেন্টো নোট বই। না নিয়ে তো হোস্টেলে ফেরার উপায়ও নেই।

অ্যাঁ, এমন দিদিশাশুড়ীর মরণ হয় না গা। কথার বাঁধুনীতে 'কে কার অলঙ্কার।' আর হবে না কেন, হিমালয় নির্ঝরিণীকে দেখেই তো বোঝা গিয়েছিলো। নির্ঝরিণী দেখেই তো জলপ্রপাত অনুমান করা যায়। কঞ্চি দেখেই তো বোঝা যায়, বাঁশের ঝাড় কোন রকম। এমন দিদিমা না হলে, অমন নাতনী হয়!

অথচ চিরকালই শুনে এসেচে অশোকস্তম্ভ, দিদিশাশুড়ীরাই বিয়ের পর নাতজামাইদের বিপদবারণ প্রশ্রয়-প্রদানকারিণী মাদুলি বিশেষ।

নাতজামাই-নাতনীদের মধ্যেই নিজেদের হারানো দিনগুলো ফিরে পান দিদিশাশুড়ীরা। এই সব পুরোনো ঘি আছে বলেই না, আজও

বিপদে আপদে মকরধ্বজ হিসেবে কাজ দেয়। মকর সংক্রান্তি জামাই ষষ্ঠীতে এরাই না ষষ্টির কাজ করে! এই দিদিশাশুড়ীরাই না ভালবাসার শুঁড়িখানার গোপন পথ বাৎলে দেয় অর্বাচীনদের!

যে সংসারে দিদিশাশুড়ী নেই. সে শ্বশুরবাড়ী তো নুন-লঙ্কা বিহীন বিউলির ডাল। শ্বশুরবাড়ীর শোভা বলতে ঐ দিদিশাশুড়ী। এই বুড়ীগুলোই তো সেকাল একালের সেতু।

সেই গৌরীদানের যুগে, কখন অন্দরমহলে প্রবেশ করেছিলো, ভয় ভাবনা নিয়ে। কখন যৌবন এলো, কখন গেলো কে তার খোঁজ রাখে! সেই হারানো পুরানো যৌবন ফিরে পান তাঁরা নাতি নাতনীদের মধ্য দিয়ে।

আটীগ্রামের জয়জগদীশ্বর বিয়ে করলো—আটীগ্রাম থেকে মাইল সাতেক দূরে নান্নার গ্রামে। বউ গেছে বাপের বাড়ী। রাত্তিরে একা একা ঘুম আসে না। কী করা যায়! রাত এগারোটা পর্যন্ত ব্যবসায়ী বাপ পুত্রকে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে আটকে রাখেন।

কিন্তু কথায় বলে, নতুন বিয়ে করা বর আর সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার সমান। রাত বারোটার সময় বাড়ীর সবাই ঘুমুলে, পাশবালিশটাকে চাদর দিয়ে ঢেকে বিছানায় শুইয়ে, সাইকেলে সোজা শ্বশুরবাড়ী। পাকা রাস্তা নয়। বনবাদাড়, ক্ষেত, মেঠো পথ ভেঙ্গে। কাক-পক্ষীটি পর্যন্ত টের পেতো না। অবশ্য অত রাত্রে কাকেরা কিছু জেগেও থাকে না। জেগে থাকতেন জয় জগদীশ্বরের দিদিশাশুড়ী। আর তিনি প্রতিদিনই টের পেতেন। আর টের পেতেন তাঁর পাশে শোয়া জগদম্বা দেবী।

বাইরের পাঁচিল টপকে ধপ করে পড়তে একটু যা শব্দ হতো। তারপর নির্দিষ্ট দরজায় বার দুয়েক ঠক্ ঠক্ শব্দ। ভিতর থেকেও সাঙ্কেতিক শব্দ হতো। বাইরে থেকে তার শাব্দিক প্রতি উত্তর মিললেই দরজা খুলে যেতো। দিদিশাশুড়ী ঘর থেকে বেরিয়ে একগাল হেসে, অভয় দিয়ে পাশের কামরায় চলে যেতেন। আর

এ ঘরে শ্রীমান জগদীশ্বরের উদ্যত বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হবার কৃত্রিম প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম ভয় মিশ্রিত করে বলতেন জগদম্বা : যাই বল, আমার কিন্তু ভয় করে বাপু।

—কী! হাসতে হাসতে নবোঢ়াকে কাছে টেনে এনে বলতো জয়জগদীশ্বর : কিসের ভয় বল তো?

—যাও, আমি জানিনে। দেখবে শেষে কী লজ্জায় পড়ি।

অন্ধকারে শ্রীমতীর লাল হওয়া বোঝা যেত না, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ধরা পড়তো। সেদিকে লক্ষ্য করে বলতো জয়জগদীশ্বর—সে যে মধুর লজ্জা গো!

স্বামীর বক্ষে মুখ লুকিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে বলতেন জগদম্বা : হ্যাঁ, তুমি তো বলবেই। তারপর সময় বুঝে ফাঁকি দেবে। তোমরা পুরুষরা তো এমনই!

সোহাগে শ্রীমতী জগদম্বাকে ভরে দিয়ে বলতো জয়জগদীশ্বর : কেন শ্রীকৃষ্ণের মতো কলঙ্ক ভঞ্জন করে দেবো শ্রীমতীর!

—হ্যাঁ, কত দেবে! আজকালকার কৃষ্ণরা কলঙ্ককলসীর ছিদ্র বন্ধ করা তো দূরের কথা, বরং ছিদ্র অনুসন্ধানে ওস্তাদ। নিজেরা ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াতে পারে, তাতে দোষ নেই, পান থেকে চুন খসলেই মেয়েদের বেলায় দোষ।

—আহা-হা, বেশ তো, তোমরা না হয় পাতায় পাতায় ভ্রমণ করতে পারো। জয়জগদীশ্বর উদার কণ্ঠেই বলে।

বাধা দিয়ে শ্রীমতী বলতেন : কিন্তু যাই বল বাপু, এরকম চুরি করে আসাতে আমার ভয় করে।

উদ্দাম হাসি হাসতে যেয়ে অনেক কষ্টে তাকে চেপে বলতো : চুরি করে খেতে যে কত আনন্দ তা যদি জানতে গো! কেষ্টঠাকুর শ্রীমতী রাধাকে যদি সহজ ভাবে পেতেন, তাহলে কি আর বৈষ্ণব-কবিরা এত লাফালাফি করতেন, না এত পদাবলী পেতাম আমরা! এত বাধা ছিলো বলেই না শ্রীমতী রাধা এত মধুর। রিস্ক্ আছে

বলেই না পরকীয়া প্রেম এতখানি জুড়ে আছে বৈষ্ণব-সাহিত্যে। আমি তো সে তুলনায় নিজের স্ত্রীকে পরকীয়া ভেবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছি গো।

একটা জব্বর চিমটি কেটে বলতেন জগদম্বা : দেখবে একদিন ধরা পড়ে কেলেঙ্কারী করবে।

কেলেঙ্কারীই করেছিলো জয়জগদীশ্বর। সেদিন নয়। সেদিন অন্যদিনের মত ভোর হবার আগেই কেটে পড়েছিলো। জাগিয়ে দিয়েছিলেন জগদম্বা নিজেই।

এরপর দিনকয়েক ব্যবসাসূত্রে আটকে পড়তে হয়েছিলো। সাটুরিয়া বন্দরে নতুন চালান এসেছিলো শুকনো লঙ্কার। আর এর মধ্যেই লঙ্কাকাণ্ড। কে জানতো মাঝখানের সাতদিন আসেনি শ্বশুরবাড়ী জয়জগদীশ্বর, আর ইতোমধ্যেই এক অ্যালসেশিয়ান কুকুর কিনেছেন মাননীয় শ্বশুরমশাই। ভাগ্যিস বাচ্চা, নইলে কী যে হতো!

মাসের অন্য দু-দশদিনের মতো, পাশ-বালিশ চাদর দিয়ে ঢেকে তার মাথায় যাত্রার দলের পরচুলা লাগিয়ে জয়জগদীশ্বর তো মেঠো-পথ ভেঙে, বনবাদাড় ডিঙিয়ে মনের স্ফূর্তিতে গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে (সাতদিনে বিরহটা যাচ্ছেতাই রকম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো তো!) চলেছে। আর সেই গানের আমেজে দু-পাঁচটা নেড়ীকুকুরও যে সাড়া তথা দু একবার তাড়াও লাগায়নি তা নয়। কিন্তু যে স্বয়ং জগদম্বার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছে, তাকে নেড়ীকুকুর কী করতে পারে!

নেড়ীকুকুরদের অতিক্রম করে এঁদো পুকুরের পাশ দিয়ে, কোন বাড়ীর গোয়াল ঘরের পাশে শায়িত ঘুমন্ত ষাঁড়ের লেজ মাড়িয়ে, তাদের গুঁতো খাওয়ার হাত থেকে তড়িৎগতিতে সাইকেল ও নিজেকে বাঁচিয়ে, 'বৃন্দাবন নহে দূর, মন মোর' প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গানের কলি

ভেজে অবশেষে ময়নামতীর দেশে (জগদম্বাকে আদর করে ময়না ডাকতো কিনা কে জানে) পৌঁছেছিলো জয়জগদীশ্বর।

সাইকেলটা বাইরে তালা লাগিয়ে রুমাল দিয়ে যথাসম্ভব গা গতর ঝেড়ে মুছে পকেট চিরুনী দিয়ে মাথাটা এক পলক আঁচড়ে, এক সময় সেই পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়েও ছিলো। আহা-হা, পাঁচিল-রে! বিল্বমঙ্গল থেকে আরম্ভ করে, চোর-শ্রেষ্ঠ ধনা বাগ্দী—কার কাছে না এ পাঁচিল পরিচিত! প্রেমের পথ যদি সমতল হতো, তাহলে কি আর এমন মধুর হতো! চাঁদ অসমতল বলেই না (ইদানীং বিজ্ঞানীরা তাই নাকি বলছে) এত আদরের!

পাঁচিল টপকে সবে নিচে নামবে জয়জগদীশ্বর আর অমনি কিনা সশব্দে তেড়ে আসা। নিঃশব্দে তেড়ে এলেও না হয় কথা ছিলো! ধ্যেৎ—তাহলে নেড়ীকুকুর আর অ্যালসেশিয়ানে তফাতটা কী? এই বুঝি আভিজাত্যের চিহ্ন!

আর তেড়ে আসারই বা কী হয়েছে শুনি! সাতটা দিন না হয় বিরহের চাপে মাত্রাজ্ঞানের অভাবে ধপ করে না পড়ে, টিপ করে পড়েছে জয়জগদীশ্বর। না হয় অজ্ঞাতসারে বেরিয়েই গেছে মুখ দিয়ে, আমি এসেচি, এসেচি বঁধু হে, তব লাগি নিয়ে ছাঁচি পান।

কিন্তু তাই বলে হতভাগা কুকুর জামাই জামাই গন্ধও পেলো না জামা কাপড়ে! কথায় বলে নতুন জামাই দাঁড়িয়ে থাকলে একমাইল পর্যন্ত তার খুশবু ছড়ায়। এমন কি জামা দেখেই জামাই চেনা যায় পর্যন্ত। আর ধরতে পারলে না একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর। হেরিডিটির দিক থেকে যার মাতৃকুল নাকি শিয়াল পণ্ডিতের বংশ!

অবশ্য কুকুর দিয়েই চোর ধরে আজকাল। খুনী আসামীও ধরে। কিন্তু কুকুর দিয়ে জামাই ধরার কথা শুনেছে কেউ কখনও? নাকি, কুকুরদের দিয়েই জামাই চিনে আনা হবে এখন থেকে?

কিন্তু যা হবার তা ততক্ষণে হয়ে গিয়েছিলো। ভীমরুলের চাক আমি দেখিনি। শুনেছি সে নাকি বেশ হৃদয়বিদারক দৃশ্য। অবশ্য

যদি কেউ অনুগ্রহ করে তাতে একটা ঢিল মেরে দেয়। হৃদয় নিয়েই নাকি টানাটানি তখন। জয়জগদীশ্বরের অবস্থা নাকি তার চেয়ে খুব বেশী খারাপ হয়নি।

সাঙ্কেতিক শব্দ করে যে নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকবে সে অবকাশই বা কোথায়? বিশেষ করে বারান্দায় বন্দুক হাতে নিয়ে মাননীয় শ্বশুর-মশাই। হ্যাঁ, দোনলা বন্দুক। একটা ফসকালে, আর একটা যাতে কাজে লাগে। অবশ্য শ্বশুর মশাইদের হাতের টিপ চিরকালই অনবদ্য। এঁরা যাকে তাক করেন, তাকে ঘায়েল না করে ছাড়েন না। এর জন্য অবশ্য কিছুদিন তাকে-তাকে থেকে তাক ঠিক করেন, এই যা।

ঠিক সেই মুহূর্তে দিদিশাশুড়ীই বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। চোর এসেচে ভেবে বেরিয়ে ছিলেন তিনিও। আধা অন্ধকারে পাঁচিলের পাশের জামা দেখেই জামাই চিনতে পেরেছিলেন তিনি। ঝটতি উদ্যতহস্ত পুত্রের দিকে ছুটে যেয়ে তাঁকে কী যেন বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালসেশিয়ানটাও যেন লজ্জা পেয়ে সেই যে কোথায় লুকিয়ে পড়লো—সারা রাত আর তাকে দেখা যায়নি।

পরের ঘটনা অবশ্য মধুর। এতদিন পর ব্যবসাক্ষেত্র থেকে জামাই এসেচে। পথে ট্রেন ফেল করেই না রাত একটা বেজে গেছে। আর জামাই মানেই তো হীরের আংটি। যে কাৎ করেই রাখো জ্বলজ্বল করবেই।

সুতরাং সেই হীরের আংটির জন্য রাত দুপুরে পুকুরে জাল ফেলে রুইমাছ ধরা হয়েছিলো। গোয়ালাবাড়ী থেকে সরেস দই আনানো হয়েছিলো। শালী-শালাজ মিলে সেই রাতে কী কাণ্ডমাণ্ডই না করা হয়েছিলো!

কিন্তু সেই রুইমাছের বিরাট মাথার সামনে বসে জয়জগদীশ্বরের মাথা বারবারই লজ্জায় নুয়ে পড়ছিলো।

দিদিশাশুড়ী অবশ্য হেসে বারবার পরিস্থিতিকে হাল্কা করতে চেষ্টা করছিলেন: লজ্জার কী ভাই। চুরিও করনি, ডাকাতিও করনি

পরের ঘরে। আর এর দরকারও ছিলো, জগদম্বার ছেলে হবে যে! শেষে কি পাতাকাটা-জামাইয়ের ব্যাপার করতে হবে!

—সে আবার কী?

—তাও জানো না! তবে শোন—আগের দিনের কুলীনরা তো হাজারগণ্ডা বিয়ে করেই খালাস। অনেক বউই থাকতো বাপের বাড়ী। স্বামীদের হয়তো খোঁজ নেবারও অবকাশ থাকতো না। কোন কোন ক্ষেত্রে অঘটন ঘটতো। ইজ্জৎ বাঁচাতে উপায়ও উদ্ভাবন করতে হতো। একদিন ঝড়বৃষ্টির রাত দেখে বাড়ীর কর্তা ছুটতেন পাশের বাড়ী থেকে কলার পাতা কাটতে। কী ব্যাপার গো, এত রাত্রে কলার পাতা কাটে কে? —না, জামাই এসেচে। ঝড় বৃষ্টিতে কে আর বাসন-কোসন মাজে। তাই পাতা কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে, জামাই এসেচে না ছাই। কে আর অতরাত্রে জল-ঝড়ে জামাই দেখতে আসচে! পরদিন সকালবেলা রটিয়ে দিলেই হলো জরুরী-কাজে জামাই খুব ভোরে চলে গেছে। তারপর আঁতুড় ঘরে শাঁখ বাজার দিন কেউ সন্দেহ করলে, সাক্ষী তো আছেই। ঐ যে—যার গাছে কলাব পাতা কেটেছে, সেই সাক্ষ্য দেবে'খন।

সবই বলেছিলেন দিদিশাশুড়ী, শুধু একথা বলেন নি, সর্প হয়ে দংশন করে ওঝা হয়ে নিজেই ঝেড়েছেন। আসলে কুকুর পোষার বুদ্ধিটি দিদিশাশুড়ীর মাথায়ই এসেছিলো। তা যে অন্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে এজন্যও, এটা অবশ্য কুকুরের প্রভুও জানতেন না।

হায়রে, কোথায় সেই জয়জগদীশ্বরের দিদিশাশুড়ী আর কোথায় অশোকস্তম্ভের দিদিশাশুড়ী শ্রীমতী নিলাজলতা দেবী।

কিন্তু দিদিশাশুড়ী নিলাজলতার যদি লাজের বালাই না থাকে, তবে অশোকস্তম্ভই বা কোন সুবাদে লাজলজ্জার ধার ধারবে? বিশেষত লজ্জা ঘৃণা ভয় এই তিনটি থাকা নতুন জামাইদের নাকি কেতাব বহির্ভূত। তার বংশে কেউ চামড়ার ব্যবসা করেছেন কিনা

জানে না অশোকস্তম্ভ। কিন্তু চোখের চামড়ার কারবার তার যে নেই এ বিষয়ে গ্যারান্টি দেওয়া যায়।

সুতরাং পূর্ব নির্দেশ মতো অর্থাৎ টালীগঞ্জের এঁদো মাঠের কোণে (অশোকস্তম্ভ মিথ্যে বলেছে বোধহয়, টালীগঞ্জে এঁদো মাঠ কোথায় মশায়!) দেখা সাক্ষাতের সময়কার নির্দেশ মতো রাত এগারোটায় বাসায় ফিরলেন শ্রীমতী হিমালয় নির্ঝরিণী চন্দ। ফিরতেই দিদিমা থেকে আরম্ভ করে আর যারা যারা এক্ষেত্রে বকুনি দিতে পারেন, সবাই একহাত নিলেন। সব মুখের ভাষা একত্র করলে তা থেকে যে সারমর্ম বেরুলো, তা অনেকটা এই রকম ঃ

—জামাই এসে বসে আছে, আর মেয়ে কিনা কোন বন্ধুর বাড়ী যেয়ে আড্ডা দিচ্ছে। না সিনেমায় গেছে। ধন্য মেয়ের সাহস। বিয়ের পর সাহস যেন আরও একশ'গুণ বেড়ে গেছে (যেন বিয়ের আগে কুমারী মেয়েদের মোটেই সাহস থাকে না বা তারা সিনেমায় যায় না)। এতে জামাই-ই বা কী ভাবে। কী না ভাবতে পারে। হলেই বা আজকালকার জামাই, আজকালই না হয় জামাইরা বিয়ে করে বউকে পটের বিবি করে বসিয়ে রাখে (আমার দুর্ভাগ্য, আমি পটের বিবি দেখিনি)। আজকালই না হয় জামাইরা সকাল বেলা ঘুঁটে দিয়ে কয়লার উনুন ধরিয়ে চা করে প্রথম কাপটি ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দেয় (ঘুমন্ত ইস্তিরীরা চা কী ভাবে খায় আমি তাও দেখিনি। অবশ্য স্টোভ থাকতে কেন কয়লার উনুন ধরিয়ে চা করে সেটা আমি অনেক কষ্টে জেনেছি)। পাছে জোরে ডাকলে পটের বিবিদের চমকে ওঠার দরুন হার্টে আঘাত লাগে আজকালকার জামাইরা না হয় সেজন্য খুব মিহি কণ্ঠে যার যার স্ত্রীর নামের আদ্যক্ষর ধরে ডাকে। মধ্যাক্ষর করে ডাকলেও অবশ্য আপত্তি নেই। ডাকতে ডাকতে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার গরম করে আনে। কিন্তু কোন জায়গায় দেখেছিস নতুন জামাইকে রেখে রাত এগারোটা বাজিয়ে কোন মেয়ে বাড়ী ফেরে? এমন নয়, দশ

বছর পাঁচ বছর একসঙ্গে ঘর করছে—পুরানো হয়েছে, জামাইয়ের উপর একটা প্রভাব প্রতিপত্তি হয়েছে (ভগবান জানেন, নতুন কালেই যা বধূরা স্বামীদেবতাদের কাছ থেকে সুবিধে পেয়ে থাকেন)।

যাহোক এমতাবস্থায় নতুন জামাইকে চটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিশেষ করে রাত এগারোটার সময় (বকতে বকতে অবশ্য বারোটাই প্রায় বেজেছিলো) শ্বশুরবাড়ীতে কোন জামাই না খেয়ে না থেকে চলে গেছে শ্বশুরবাড়ীর ইতিহাসে এমনটা শোনাও যায় না।

আর জামাই রাখার হাঙ্গামাও কিছু নয়। যুদ্ধের সময় একটা কার্টুন দেখেছিলাম, স্থানাভাবের জন্য আলমারির তাকে বরকনেকে থাকতে দিয়েছে এক শ্বশুরবাড়ীতে। আর তার মধ্যেই আরামে রাত কাটিয়ে শ্বশুরবাড়ীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন এক নব-জামাতা।

আমাদের বন্ধু হিমকল্যাণ গোঁসাই বলতেন, নতুন জামাইকে খুশী রাখার সর্টকাট পন্থা জান ? ভাল খাওয়া দাওয়া, ভাল উপহার কিছুর দরকার নেই। দরকার স্রেফ একখানা ঘর। তা তোমার আস্তাবলেই হোক, ভাঁড়ার ঘরেই হোক, আর সিঁড়ির নীচেই হোক। ছোট একটা নিরিবিলি ঘর দাও। চড় চড় করে ভালবাসা উপচে পড়বে। এদিকে তুমি পোলাও কালিয়া না করে আলুসেদ্ধ কলায়ের ডাল যা চালাও না কেন কিছু যায় আসে না। চাইকি স্রেফ হাওয়া খাইয়েও রাখতে পারো।

সুতরাং পড়ুয়া ছেলের শ্বশুরবাড়ী রাতকাটানো (না, অশোকস্তম্ভকে সিঁড়ির নীচের ঘরে বা আলমারির তাকে থাকতে হবে না) পছন্দ করেন না যে দিদিশাশুড়ী তিনিও নরম হলেন।

শুধু চশমার বেড়া টপকে সমস্ত ব্যাপারটার দিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কৃতান্তদমন বাবুর কণ্ঠ থেকে বেরিয়েছিলো, হুঁ।

এই 'হুঁ' শব্দ দ্বারা তিনি ঠিক কি বুঝাতে চেয়েছিলেন, আমরা তা বলতে পারবো না। সম্ভবত, এই বলতে চেয়েছিলেন, আজকালকার ছোকরাদের আর লাজলজ্জার বালাই নেই। যে কোন

'আনফেয়ার মিনস্' অবলম্বন করে একশ' মিটার দৌড়ে জেতা আর কি ? জেতাটাই যেন এদের লক্ষ্য, স্পোর্টস্ এর দিকটা এরা একবার ভাবে না।

রাতে হিমালয় নির্ঝরিণী বলেছিলেন : আমাকে বকুনি খাওয়ালে শুধু শুধু। ইচ্ছে হয়েছিলো দেই সব ফাঁস করে।

অশোকস্তম্ভ শ্রীমতী চন্দের মুখচন্দ্র দুহাতে তুলে ধরে বলেছিলো : দিলেই পারতে ফাঁস করে। আমিও ভাঙতাম।

—কী।

—হাঁড়ি।

—হাঁড়ি ? হাঁড়িতে কি আছে অ্যাঁ !

—কেন তোমার কীর্তিকেচ্ছা সব।

—ই-ইস্, সেদিক থেকে তো তুমিই গুরুদেব গো।

—গুরুদেব ! আরে না, না, আমি তো শিশু। এসো তোমাকে এক গুরুদেবের গল্প শোনাই। আজ রাতে আর ঘুমুবো না, বুঝলে ! জানো না এখনও অনেক শ্বশুরশাশুড়ী আছেন যাঁরা দম্পতিকে বিশেষ করে বিবাহিতা মেয়েকে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি ঘুচাতে দিনের বেলা ঘুমোতে দেখলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কি জন্যে জানো, তাঁদের মেয়ে, জামাইএর মন জয় করতে পেরেছে এই ভেবে। হিমালয় বলেছিলেন : এমন সব তুমি জানলে কী করে গো, অ্যাঁ। তবে না তুমি ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানো না !

অশোকস্তম্ভ বলেছিলো : আমি আর কতটুকু জানি। শোন তাহলে আমাদের বন্ধু—অবিনাশ মুখুজ্যের কথা।

বারাসতের ওদিকে কোন একটা হাইস্কুলে মাস্টারী করতো অবিনাশ এম. এ. পাশ করে। বি. টি. পড়বে বলে সস্ত্রীক এলো কোলকাতায়। কিন্তু বউ নিয়ে ওঠে কোথায় ? বাসা করলে শুধু খরচই বেশী নয়, পড়াশোনারও অসুবিধে সংসারের পাঁচ ঝামেলায়

বাজার কর রে, হাট কর রে, এটা আনো রে, সেটা আনো রে, কত কী। তবে উপায় ?

তবের কিছু নেই। অবিনাশের বড়মামা কোলকাতার এক বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। মোটামুটি নামকরা অধ্যাপক। তিনি বললেন: বৌমা কোথায় থাকবেন, সে ভাবনা আমার। তুমি নিরিবিলি পড়তে চাও তো হোস্টেলেই যাও। আর হোস্টেলে থাকলে বইপত্রের দিক থেকেও সুবিধে। পাঁচরকম বই হাতের কাছে পাবে। আর ছাখো, বৌমাদের দেখাশোনা করার জন্য তোমার যখন তখন আসার দরকার নেই। ওতে পড়াশোনার ক্ষতি হয়। সেজন্য আমিই তো আছি।

তা আছেন বৈকি! যোগ্যতম অভিভাবক হিসেবেই আছেন। অবিনাশচন্দ্রের বিয়ের ব্যাপারেও মামা। ওঁর ওখানে থেকেই বিয়ে। অবশ্য এ বিয়েতে মত ছিলো না বড়মামার। তিনি ঠিক করেছিলেন গোলক দত্ত লেনের এক বি. এ. পাশ বীণাবাদিনীকে। সেই কুমারী, ছেলে মাস্টারী করে শুনে সেই যে চান করতে বাথরুমে ঢুকেছিলেন কনে দেখার দিন, তিন ঘণ্টার মধ্যে বেরুননি। কে জানে বীণাতে বেহাগ তুলছিলেন কিনা বাথরুমে বসে!

ভাগ্যে অবিনাশ জেদ করেছিলো অন্য এক কুমারীকে বিয়ে করার জন্য। কুমারটুলির এক কুমারী। যার গান শুনে বাড়ীর চেন-বাঁধা কুকুরটি বার বার কেঁদে উঠছিলো। সেও আর এক কনে দেখার দিন। কুকুরের হৃদয়তন্ত্রীকে যিনি সাড়া জাগাতে পারেন, তিনি যে মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে সপ্তসুর বাজাবেন এই ভরসায় শ্রীমান অবিনাশ চন্দ্র সেই মনু চৌধুরীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। তদুপরি বিলেত-ফেরত হয়ে আসার লোভনীয় সুযোগ, টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, মনু চৌধুরীর ফিল্ম প্রডিউসার বড়দাদা। অবশ্য বিলেত-ফেরত কথাটার এত দাম কেন যে বুঝিনে আমি। বিলেত থেকে যে ফেরত এলো, ফেরত পাঠালো যাকে বিলেতওয়ালারা, তার

যোগ্যতা নিয়ে এত হৈ চৈ কেন যে আমাদের দেশে তাও আমার বোধগম্য নয়। বিলেতে থাকলেও না হয় তার প্রশংসা করতে পারি। অথচ সবাই বিলেত-ফেরত হতে চায়। ওরকম ফেরত তো যে কেউ হতে পারে কিছু পয়সা থাকলে। নিদেনপক্ষে একটা প্যাসেজের পয়সা। তারপর সেখানে একটা চাকুরী বাগানোও নাকি কিছু কঠিন নয়। অবশ্য আমি কোনদিন অন্তত নিজের টাকায় বিলেত যাবো না। যে দেশে চাঁদ উঠলে, লোকে ফোটো তোলে স্মৃতিচিহ্ন রাখার জন্য, আবার কবে চাঁদ দেখা যাবে সেই বিচ্ছিরী আবহাওয়ার দেশে সেই ভয়ে ; সেই দেশের নাকি এই বিতিকিচ্ছিরী প্রশংসা! অথচ ছ্যাখো বিলেত দেশটাও মাটির। কিন্তু অবিনাশ মুখুজ্যের মুখে সেই দেশে যাবারই আনন্দ। কিন্তু বিলেত যাবার টাকা বিয়ের পর দেবেন শ্বশুর এই প্রস্তাব শুনে বড়মামাই বলেছিলেন, বাকি বিলেতে, বিলেত যাওয়া যায় না।

সম্ভবত তিনি এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন, নগদ পয়সা থাকলেই বিলেত যাওয়া যায়। যে কোন মুদিও বিলেত যেয়ে ফেরত আসতে পারে। হাজার হলেও একজন অধ্যাপক মানুষ। তাঁদের দূরদৃষ্টি টেলিস্কোপকে পর্যন্ত হার মানায়।

হলোই নাতো শেষ পর্যন্ত বিলেত যাওয়া! ভাগ্যিস্ যায়নি নইলে তো ফেরত আসতে হতো। বিলেত না গেলেও হোস্টেলে যেতে হলো অবিনাশকে। বালীগঞ্জ সানি পার্কে বি. টি. হোস্টেল। আর বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে বি. টি. কলেজ। যেমন লাল বাড়ী, তেমনি লাল আভিজাত্যপূর্ণ। পড়তে হলে এমন বি. টি. কলেজেই পড়তে হয়। আর কলেজের কম্পাউণ্ডের মখমলের মতো ঘাসের গালিচায় একবার গড়িয়ে নেবার সৌভাগ্য তো দেববাঞ্ছিত। ঐ সঙ্গে দেবকন্যারা যদি আশেপাশে থাকেন। অবিনাশ যখন বি. টি. পড়তো তখন দেবকন্যারাও ঐ কলেজে পড়তেন। সবই ভাল ছিলো, কিন্তু মুশকিলের মধ্যে ছিলো জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপকদের

জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। কী করে যে তাঁরা এত জ্ঞানগর্ভ হন কে জানে! আমি কোনদিন কোন অজ্ঞানগর্ভ অধ্যাপক দেখিনি। অবশ্য অধ্যাপিবাও নয়।

সেদিক থেকে মাস্টার মশাইরা অনবদ্য। মাস্টার হলেই তাঁরা 'জ্যাক' হন। হ্যাঁ, বাঙালী হলেও ইংরেজ জ্যাক হতে বাধা নেই। এমন কি 'জ্যাক অব অল ট্রেডস্' হন তাঁরা। বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতির নিয়মানুসারেই তাই হতে হয় তাঁদের। অঙ্কের এম. এ. কেও সংস্কৃত পড়াতে প্রস্তুত থাকতে হয়। মাস্টার হয়েও কোন বিষয়ের মাস্টার হন না তাঁরা। মাস্টার হয়েও ঐখানেই তাঁদের বিচ্যুতি।

এদিকে বি. টি. কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা মহোদয় মহোদয়াদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় জ্ঞানভাণ্ড ভরলেও মনভাণ্ড ভরে না। আর তা ভরাতে গেলে একটু আধটু চালাকী করতেই হয়। যেতে হয় ক্লাশ পালিয়ে ফুলু বৌদিদের বাড়ী। কৌশলে নিজেকেই প্রস্তাব করতে হয়—আপনাদের বাড়ী বেড়াতে আসার জন্য মন্টুর তো খুব ইচ্ছে। বলে কতদিন গাইবাঁধার ফুলুদিদিকে দেখিনি। এদিকে আমার তো দিনের বেলা একদম সময় নেই (যেন অবিনাশ রাত্রিতেই গিয়েছিলো)। যা পড়ার চাপ বি. টি. কলেজে। এক, সময় একটু যা পাওয়া যায় রাত্রি বেলা। রাত্রিতে এলে আবার হোস্টেলে ফেরা মুশকিল। রাত ন'টার মধ্যে হোস্টেলে না ফিরলে আবার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ভয়ানক আপত্তি করেন। মন্টুকে আনতে চান তো বাড়ীর কাউকে পাঠিয়ে এক আধদিন এনে রাখুন।

ফুলুবৌদি বলেন ঃ আমারও ইচ্ছে কয়েকদিন এনে রাখি। আহা, কতদিন দেখিনি মন্টুকে। আপনার দাদাও বলেছেন সেদিন। কিন্তু আপনার দাদার সময় কই? আর ঠাকুরপোকে দিয়েও হবে না! আপনার মামাবাবুর সামনে কথাই বলতে পারবে না। যা রাশভারী লোক শুনেছি। আপনি নিজেই বরং মন্টু-বোনটিকে নিয়ে আসবেন। আর রাতে হোস্টেলে একদিন নাই-বা ফিরলেন!

—পাগল! হোস্টেলে যা আজকাল কড়াকড়ি নিয়ম। হোস্টেলে তো থাকতে হয়নি আপনাকে কোনদিন। বিশেষ করে নতুন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অধ্যাপক ভট্টাচার্য যা কড়া লোক!

নিখুঁত ভাবেই বলেছিলো অবিনাশ মুখুজ্যে। কলেজে থিয়েটার করে করে ও-বিদ্যেটায় বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছিলো তো!

কিন্তু বৌদিদের যুক্তিতে হারানো কি এতই সোজা! বিশেষ করে সে বৌদি যদি গাইবাঁধার ফুলু বৌদি হন!

বলেছিলেন ঃ যথেষ্ট হয়েছে খোকা মাস্টার মশাই। মাস্টারদের তো হোস্টেল, তার আবার কড়াকড়ি! একি ছেলেছোকরাদের হোস্টেল, হাতকড়ি দিয়ে আটকে রাখতে হবে?

এর পর আর কীই বা বলতে পারে অবিনাশ মুখুজ্যে?

এই ঘটনার ঘণ্টাখানেক পরই মামার বাসায় বড় মামীমার সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছিলো শ্রীমান অবিনাশকে। হ্যাঁ, পড়াশোনার ক্ষতি করেই। অধ্যাপক মামা সেদিন বর্ধমান না আসানসোলে এক সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়েছেন।

আর সেই সুযোগে মহিলামহলের সভায় সভাপতির ভাষণ দিচ্ছে, অবিনাশ মুখুজ্যে।

—ব্রজেনদা মানে ডাক্তারদা ধরেছেন, আপনাদের বৌমাকে ওঁদের বাসায় নেবার জন্যে। দু-একদিন থেকেই চলে আসবে। অনেকদিন থেকেই বলছেন। আমিই গা করিনি। কালকে তো আমার হোস্টেলে যেয়ে, সে সাংঘাতিক ধরাধরি। বলেন, আমার বাসায় পূর্ণিমার নিশিপালন উৎসবে তোমার স্ত্রীকে আনার বাসনা। বৌমার কুকুর-কাঁদানো গান অনেকদিন শুনিনি।

মিথ্যে বলতে একটু বাধছিলো। একেবারে গুরুজনের মুখোমুখি মিথ্যে কথা বলতে কেমন যেন গা শিরশির করে। পরক্ষণেই মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলো, প্রেমে আর রণে অতসব নীতি মানলে চলে

নাকি? নীতি মানলে পিরীতিই হয় না। আর এ প্রেম বৈকি! নিজের ইস্তিরীর সঙ্গে কি আর প্রেম হয় না! আসলে প্রেমের জন্মস্থানই হচ্ছে মন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, ভালবাসা জন্মায় ভাল বাসায়।

তা বলুক গে। ততক্ষণে মামীমা বলছেন—তা নেবে, দোষ কি। কিন্তু পূর্ণিমার নিশিপালন উৎসব, সে আবার কি? সে কি অষ্টমী নবমী তিথিতেও হয় নাকি আজকাল!

আরে সর্বনাশ! সত্যিই তো, মিথ্যে বলার সময় তিথি নক্ষত্রটা একবার ভেবে বলা উচিত ছিলো। ভাবা উচিত ছিলো, অধ্যাপকের স্ত্রী হলেও, একাদশী পূর্ণিমা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল হতে পারেন। আর যিনি এতবড় একজন অধ্যাপকের হাল ধরে আছেন, তাঁর কাছে তাল সামলানো সহজ নাও হতে পারে। সর্ষে সামলানোই মুশকিল। এইজন্যেই বুঝি বলা হয়ে থাকে চোর আর খুনেরা কোন না কোন সূত্র রেখে আসে। সে সাদা সূত্রই হোক আর কালো সুতোই হোক।

কিন্তু তখন কি আর পিছুলে চলে!

—ঐ অষ্টমীর নিশিপালনই বোধহয় মামীমা। অবিনাশ পঞ্জিকা সংশোধন করে।—শকাব্দ-মতে আর কি? আমি অবশ্য বাংলামতেই ভেবেছিলাম। ঐ যে চাটার্জি মত না কি আছে একটা—তাই বোধ হয়।

—চাটার্জি মত বলে পঞ্জিকায় আছে নাকি কিছু? মামীমার সন্দেহ যায় না। গোস্বামী মত বলে একটা মত অবশ্য আছে কিন্তু চাটার্জি মত কিছু আছে বলেতো জানিনে ভাগ্নে!

ভাগ্নে অবিনাশও জানে না। জানলে কি আর অমন পঞ্জিকা সংস্কার করে! সেই কবে সম্রাট আকবর শাহা একবার পঞ্জিকা সংস্কার করেছিলেন। এযুগে ডঃ মেঘনাদ সাহা নাকি একবার সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। করেছিলেন কিনা তাও জানে না অবিনাশ।

মাস্টারীতে গঞ্জিকা এবং পঞ্জিকা দুইই দুরধিগম্য অবিনাশের কাছে। ইংরেজীতে ইয়ার নিয়ে ভাবতে হয় এখন। লিপ ইয়ার নিয়েও ভাবনা চলে! বিয়ের পর অবশ্য 'লীপ' নিয়েও একটু চিন্তা এসেচে। লীপস্টিক সম্পর্কেও। কিন্তু হলপ করে বলা যায়, দশজন লেখাপড়া জানা লোকের মধ্যে নয়জনই বাংলা তারিখ সঠিক ভাবে বলতে পারেন না।

এদিকে মিথ্যের স্বভাবই এই, এ যা কিছু স্পর্শ করে তাকেই মিথ্যে নদীতে অধিকতর ডুবিয়ে দেয়। নদী থেকে সাগরে। মোটকথা একবার মিথ্যে নদীতে পা দিলে কূলে ফিরে আসা সহজ হয় না।

তবে মামীমাই উদারতার দড়ি ছুঁড়ে দিলেন।

—ও, তবে বুঝি একাদশীর পারণ টারন হবে ভাগ্নে। তা বৌমাকে নিয়ে যাবে কে?

আঃ, অবিনাশ মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সত্যি মামীমারা এত ভালমানুষ হয়! অন্য কারো হাতে পড়লে মারা যেতে হতো। এত সহজে কি ন্যায়ের মীমাংসা হতো!

—আর কে নিয়ে যাবে মামীমা! ব্রজেনদা তো একদম সময় পায় না, দমদমার ডাক্তারখানা নিয়ে। আমাকেই কষ্ট স্বীকার করে পৌঁছে দিতে হবে আর কি। বুঝলেন মামীমা, আত্মীয়তা বজায় রাখার মতো ঝঞ্ঝাট আর কিছুতেই নেই। অথচ এই ঝঞ্ঝাট না করলেও আবার আত্মীয়তা থাকে না। কোথায় হোস্টেলে ফিরে মন দিয়ে পড়াশোনা করবো, তা নয় এখন লৌকিকতা বজায় রাখতে প্রাণান্ত।

যথাসম্ভব নিস্পৃহ কণ্ঠে, উপচে ওঠা আনন্দ উচ্ছ্বাসকে পেটের দিকে ঠেলে দিয়ে বলেছিলো অবিনাশ মুখুজ্যে।

লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ পাঠালে চলতো কিনা, এ সম্পর্কে অবশ্য মামীমা কিছু বলেন নি। বলেছিলেন: এনেও দিয়ে যেও তাহলে।

—না না, আমার সে সময় কোথায় মামীমা? এই যে এসেচি তাই কত পড়া নষ্ট হলো! 'ইনটেলিজেন্স চ্যাপ্টার'টা শেষ করতে পারতুম এতক্ষণ। আপনার বৌমাকে ব্রজেনদার বাসায় পৌঁছে দিয়েই হোস্টেলে চলে যাবো আমি। ওঁরাই কেউ কাল পৌঁছে দিয়ে যাবেন, গরজ যখন ওঁদেরই। আর মামাবাবু যখন কাল আসবেন না, তাঁকে আর ব্যস্ত করার দরকার নেই।

ব্রজেনবাবুরাই অবশ্য পরদিন পৌঁছে দিয়েছিলেন মনু মুখুজ্যেকে। কিন্তু সেটা অবিনাশের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী। একটি জীবন্ত রাত্রি একত্র কাটিয়ে, চাঁদ ফুলের গন্ধ মেখে, গানে গল্পে মাতাল হয়ে, পরদিন অতি ভোরে হোস্টেলে ফিরে গিয়েছিলো অবিনাশ। আর আগের দিন মামার বাসা থেকে সরাসরিও ফুলুবৌদিদের বাসায় যায়নি ওরা। তিন চারবার কালীঘাট শ্যামবাজার করে, এখানে সেখানে বউ দেখিয়ে, সানি পার্কের হোস্টেল নিরাপদ দূরত্ব থেকে নিরীক্ষণ করিয়ে রেনি পার্কের সিঁদুর কুড়ানো রাস্তায় হেঁটে, বালীগঞ্জ লেকের ধারে সল্টেড বাদাম নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, রাত দশটায় ফুলুবৌদিদের ওখানে পৌঁছেছিলো অবিনাশ। তার আগে পথে এক পোস্ট অফিস থেকে হেঁড়ে গলায় মামার কণ্ঠে সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে টেলিফোন করে বলেছিলো: দেখুন, আমি অবিনাশের মামা অধ্যাপক ব্যানার্জি বলছি, একটা জরুরী দরকারের জন্য আজকে ও হোস্টেলে ফিরতে পারবে না।

সৌভাগ্যবশতঃ সুপারিণ্টেডেণ্ট অধ্যাপক ভট্টাচার্য হোস্টেলে ছিলেন না, ফোন ধরেছিলেন, মিসেস ভট্টাচার্য।

আর পরদিন সকালে নয়—বিকেলবেলা মনু মুখুজ্যেকে মামার বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন ওঁরা। দিয়েছিলো ব্রজেনদার ছোটভাই মথুরামোহন। যমুনার পরেই মথুরামোহন।

কথা প্রসঙ্গে বলেছিলো, অবিনাশদাও রাতে ছিলেন আমাদের

বাসায়। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিলো তো। বৌদিকে নিয়ে কোথায় নাকি বেড়াতে গিয়েছিলেন।

অবিনাশের বড়মামার সামনেই বলেছিলো। তিনি সকালের গাড়ীতেই আসানসোল থেকে এসেছিলেন।

—অবিনাশ, অবিনাশও রাতে তোমাদের ওখানে ছিলো· হোস্টেল ছেড়ে?

বড়মামা বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—না, সারারাত আর কোথায় ছিলেন। রাত বারোটা পর্যন্ত তো বাইরেই ছিলেন। তারপর খেতে-টেতেই তো ধরুন গিয়ে রাত্ দুটো। অবিনাশদা আবার দুটো মুরগী নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনিই নাকি আসানসোল না বর্ধমান থেকে এনেছিলেন। আজ অবশ্য খুব ভোরেই হোস্টেলে চলে গিয়েছেন। বৌদিকে বলছিলেন, যদি সুবিধে পান তবে নাকি পাইপ বেয়ে ঘরে ঢুকে শুয়ে থাকবেন।

অধ্যাপক বড়মামার মুখ থেকে শুধু বেরিয়েছিলো ঃ হুঁ।

সব শুনে খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিলেন হিমালয় নির্ঝরিণী ঃ তোমার এরকম পাইপ বেয়ে ওঠা বন্ধু আর ক'জন আছে বল তো! ওঃ, সবকটি বন্ধুই একেবারে বিশ্বকর্মা প্রভুর কাছে স্পেশাল ফরমাসে তৈরী!

হিমালয়কে সোহাগে ভরিয়ে দিয়ে, ঘর ফাটানো হাসি হেসে বলেছিলো অশোকস্তম্ভ ঃ হ্যাঁ, বিশ্বকর্মার স্পেশাল স্বামী তৈরীর কারখানায়।

কিন্তু স্ত্রীচরিত্রই কেবল দেবতাগণেরও অজানা নয়, নববিবাহিতদের চরিত্রও তেনজিং নোরগেদের পক্ষেও দুরারোহ। আসলে নবদম্পতি মাত্রেই এক একটি গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ। না, তার চেয়েও উঁচু। ঐ যে কে একজন বৈমানিক বেশ কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, হিমালয় ছাড়িয়ে আরো আরো উত্তরে একটা নাম-না-জানা

পর্বতশৃঙ্গের হদিশ তিনি পেয়েছিলেন। যে উচ্চতা দিয়ে বিমান চালিয়ে তিনি হিমালয় পর্বত অতিক্রম করেছিলেন, তার চেয়েও নাকি অনেকটা উঁচু এক পর্বতশৃঙ্গের মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়েছিলো। নবদম্পতিরা এক একজন সেই শৃঙ্গ বিশেষ। আজ পর্যন্ত কেউ তা অতিক্রম করতে পারেনি। সেই শৃঙ্গের মধ্যস্থিত বন্দরে বন্দরে দুষ্টবুদ্ধিরূপ কত যে ইয়েতির বাস কে জানে! মাঝে মাঝে যা দেখা যায় তা কেবল ইয়েতির পদচিহ্ন। এয়োতিদেরই বেশী কিনা আজও তার মীমাংসা কেউ করেনি। না পেরেই দেবতারা নাকি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। হালে পানি না পেয়েই।

আমরাও পাইনি। আমাদেরও কত কিছু জানার বাকি ছিলো। শোনার বাকি ছিলো।

শ্রীমান অশোকস্তম্ভের বিয়ের সংবাদ আমরা কাকের মুখে শুনেছিলাম। তাই নাকি শোনার নিয়ম। বাতাসেও নাকি শোনা যায়। সংবাদ বাতাসের আগে নাকি ছোটে। আবার চাঁদ উঠলেও নাকি সবাই ছাখে। একমাত্র আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকলে চাঁদের লুকিয়ে থাকার উপায় থাকে না। অবশ্য অমাবস্যার চাঁদ দেখা যায় না। অশোকস্তম্ভ চাঁদ হয়েও অমাবস্যার চাঁদ হয়ে উঠেছিলো। লুনা-৯ পাঠিয়ে যে সেই চাঁদের ফোটো তুলে আনবো তারও উপায় ছিলো না।

হোস্টেল সে অনেক আগেই ছেড়েছিলো। ক্লাবেও সে আর আসেনি। গুজবে প্রকাশ এবার নাকি পরীক্ষা দেওয়াও বন্ধ রাখবে। হ্যাঁ, বরাবর প্রথম স্থানটি যার জন্য সবাই ছেড়ে দিতো, সেই অশোকস্তম্ভ চন্দ। অপরাধ আর কিছুই নয়। এম. এ. পরীক্ষার শেষ চারটি পেপার নাকি আশানুরূপ তৈরী হয়নি।

বৈষ্ণবসাহিত্য কী করে তৈরী হয়নি, বুঝতে পারলাম না! কারণ, সেজন্য শ্রীমতী হিমালয় নির্ঝরিণীই তো যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। প্রেম বস্তুটি কী বস্তু, শ্রীমতী হিমালয় নির্ঝরিণীও তো শ্রীমতী রাধার মতোই জানেন:

'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সোহি পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।'

এ ছাড়া,

'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।'

ইত্যাদি বহু হৃদয়বিদারক কথা দুজনকেই বলতে হয়েছে। আবার কোন সময় অবশ্য একথাও বলতে হয়েছে,

'নন্দের ঘরে গরু রাখোয়াল
তা সনে কি মোর নেহা।'

নন্দের ঘরে যে শ্রীমান গরুর রাখালী করতো শ্রীমতী রাধার তার সঙ্গে সম্পর্ক কি ?

কিন্তু হলে কি হবে! সবাই তো সব জিনিস সহ্য করতে পারে না। ইস্তিরী কারো কাছে অ্যালার্জি হয়ে দাঁড়ায়। নিরীহ পেনিসিলিনও অনেকে সহ্য করতে পারে না শুনেছি। কে জানে ইস্তিরীরা স্টেপ্টোপেনিসিলিন কিনা!

আমরা, ক্লাবের সদস্যরা, অনেক গবেষণার পর ভাষ্য করলাম, অশোকস্তম্ভ একজন ঔরঙ্গজীব বাদশা। ঔরঙ্গজীবের মতোই একই জীবনে উন্নতি ও অবনতির সমুদ্রে স্নান করেছে।

কিন্তু তখনও আরো দেখার বাকি ছিলো। এ দেখা আরও কিছুদিন পর। হঠাৎ একদিন শোভাবাজারের মোড়ে শ্রীমান অশোকস্তম্ভকে দেখলাম। হ্যাঁ, সেই অশোকস্তম্ভই। সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে দীক্ষা নেবার পর সম্রাট অশোকের কি এই রকম অবস্থা হয়েছিলো! কী হয়েছিলো আমি জানিনে, তবে আমাদের অশোকস্তম্ভের যা হয়েছিলো, তা হচ্ছে, উসকোখুসকো চেহারা, আধময়লা সার্ট গায়ে, বেশ কিছুদিন আগেকার পাটভাঙা ধুতি পরনে।

হাতে একগাদা প্যাকেট। কাপড়ের দোকানের প্যাকেট। আর খুবই ব্যস্ত ভাব।

—কী হে, চিনতেই পাচ্ছো না যে!

ব্যঙ্গ কণ্ঠেই বললাম আমি। অবশ্য আমিও এই অশোকস্তম্ভ চন্দকে চিনতে পারছিলাম না। এই একগাদা কাপড়ের দোকানের প্যাকেট সম্বলিত অশোকস্তম্ভকে। দাড়ি গোঁফের বৃদ্ধি দেখে মনে হচ্ছিলো, চাদর না হারালেও, নির্ঘাত গামছা হারিয়েছে।

চমকে উঠেছিলো অশোকস্তম্ভ। তারপর খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে লজ্জিত কণ্ঠে বলেছিলো : আরে না, না—চিনতে পেরেছি বৈকি! লেখক গোরাচাঁদ গড়গড়ীকে চিনতে পারবো না আর! আমাদের বন্ধুদের মধ্যে তুমিই একমাত্র লেখক মানুষ। লেখক আর পাওনাদার, জগতে এই দু দলকেই যা আমি শ্রদ্ধা করি।

কথায় বলে মানুষের মনের বরফকে গলাতে প্রশংসার উত্তাপের মতো অন্য কিছু তেমন কার্যকরী নয়। অশোকস্তম্ভের একটু প্রশংসার উত্তাপেই আমার মনের বরফ গলে একেবারে জল হয়ে গিয়েছিলো। তার বিরুদ্ধে একগাদা অভিযোগের প্যাকেট থাকা সত্ত্বেও, সব কিছু যেন বাষ্প হয়ে উড়ে গেলো। উত্তাপ দিয়ে আগুন জ্বেলে সেই অভিমানের গাদাই পুড়িয়ে দিলো অশোকস্তম্ভ। ফলে মুখ দিয়ে বেরুলো : হুঁ, সে যা চিনেছো তার নমুনা তো খুবই দিলে। শুনতে পেলাম, বিয়েও নাকি করেছ আমাদের না জানিয়ে। সাক্ষাৎ নাই বা করলে, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করলে কি আমরা ত্রুটি মার্জনা করতুম না! অবশ্য আজকাল পত্র না দিয়ে সাক্ষাৎ করে নিমন্ত্রণ করলে অনেকেই সেটা দোষের বলে মনে করে। অথচ বন্ধু হিসেবে আমাদেরই তো আগে জানার কথা। অশোকস্তম্ভ আরো লজ্জিত কণ্ঠে বললো : সে তো বটেই, সে তো বটেই।

সুযোগ বুঝে আমি বললাম : তারপর ছাখো, বরযাত্রী হিসেবেও আমাদের ডাক আগে পড়ার কথা। আমরা বরযাত্রী যাবো, হৈ হুল্লোড়

করুবো, কন্যাপক্ষের হাজার ক্রুটি ধরবো, পাচিংশো দিলে ক্যাপস্টান চাইবো। পাশবালিশ দিলে ব্লেড দিয়ে চিরে দিয়ে আসবো। তোয়ালে দিলে গোয়ালে ফেলে আসবো। শুভদৃষ্টির সময় কনের চোখে টর্চ ধরবো, ইলেকট্রিক লাইট থাকলেও।

অশোকস্তম্ভ ততোধিক লজ্জিত কণ্ঠে বললো : হ্যাঁ, সে তো বটেই।

আরো সুযোগ পেয়ে বললাম : তারপর ধর, তেমন তেমন বুঝলে তোমার শালীশালাজ থাকলে তাদের সঙ্গে বেলাল্লা ঠাট্টা তামাশা করবো! আমরা যে প্রত্যেকেই একজন ভাবী দিকপাল যেন তেন প্রকারে বুঝাতে চেষ্টা করবো। যাব তার নাকের :ডগার উপব সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সেকথা 'কনফার্ম' করবো। ফরমাস হোক না হোক দু চারটে ফিল্মী হিন্দী গান শুনিয়ে দেবো। বাসর ঘরে যেয়ে কান-লাল-করা কথা বলবো।

অশোকস্তম্ভ কী ভাবতে ভাবতে এবারও বললো : সে তো বটেই। সে তো বটেই।

পরক্ষণেই কী ভেবে বললো : তাই নাকি, তাই নাকি ?

আমিও কী ভেবে বললাম : অবশ্য তেমন তেমন দেখলে, মানে কনে পক্ষের লোকেরা আবার তেমন তেমন বুঝলে, অর্থাৎ তোয়ালে দিয়ে বেঁধে রাখার ভয় দেখালে অবশ্য আমরা কিছুই করবো না। চাই কি ক্যাপস্টান দিতে চাইলে, বিড়ি খাওয়ার অভ্যাসের কথা জানাবো। চাই কি ফাঁক পেলে পিঠ বাঁচাতে চলন্ত বাসে চেপেই চলে আসতাম আমরা। তাতে এই বাজারে বরপক্ষের কিছু চাল ডালও বেঁচে যেতো।

অশোকস্তম্ভ বললে : তাইতো—খুবই ভুল হয়ে গেছে তো!

চাল ডাল বাঁচবার কথা ভেবেই বোধ হয়।

আমি বললাম : ভুল তুমি এখনও করছো চন্দ। এই যে এতক্ষণ ধরে কথা বলছি, একবার তোমার বাসায় যেতে পর্যন্ত

আমন্ত্রণ করলে না। কাপড়ের প্যাকেট যখন বগলে—নিশ্চয়ই শ্রীমতীও বাসায়ই আছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার আগ্রহ পর্যন্ত দেখাচ্ছ না।

এরপর আর অশোকস্তম্ভ না বলে পারেনি : সে তো বটেই, সে তো বটেই। এসোনা আমার বাসায়, মানে শ্বশুর মশাইর বাসায় আর কি। না-না—ঘাবড়াবার কিছু নেই, শ্বশুর মশায় আজ বেশ কিছুদিন দিদি-শাশুড়ীকে নিয়ে কাশীবৃন্দাবন করে বেড়াচ্ছেন। কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকে প্র্যাকটিক্যালি শ্রীমতী চন্দকে পাহারা দিতে হচ্ছে আর কি!

অশোকস্তম্ভ প্যাকেটগুলো আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে : চলো যাওয়া যাক তাহলে, কী বল?

চন্দের আমন্ত্রণ আন্তরিক বলেই মনে হয় আমার কাছে, অতগুলো প্যাকেটের ভার আমাকে বইতে হওয়া সত্ত্বেও। ছেলেটা না হয় একটা কর্মই করে বসেচে এবং সেই লজ্জায় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু আমরা, বন্ধুরা কি তাকে ফেলতে পারি! ফেললে তো গঙ্গায়ই ফেলতে হয়। গঙ্গাই তো হিমালয় নির্ঝরণী। বরং একদিক দিয়ে বলতে গেলে, এটা অশোকস্তম্ভের একটা বিরাট জয় বলেই গণ্য করা যেতে পারে। বিরাট পর্বই এটা।

সুতরাং গেলাম। কৌতূহলের বসেই গেলাম। কৌতুক করার ইচ্ছায় ডগমগ হয়েই পা বাড়ালাম। না গেলে অনেক কিছুই দেখা হতো না আমার। না অশোকস্তম্ভের শ্রীমতী হিমালয় নির্ঝরিণীকে, না অশোকস্তম্ভের বর্তমানকে। ভবিষ্যৎকেও।

শোভাবাজার স্ট্রীট ধরে, কৃপানাথের গলি পেরিয়ে, রেডিও আর্টিস্ট বিকেলবেলা ভট্টাচার্যের নেমপ্লেট লেখা বাড়ীর পাশ কাটিয়ে কুনালকান্তি কোদক লেন। সেই লেনের মধ্যেই লেনদেন।

কিন্তু আমরা যখন পৌঁছুলাম তখন হিমালয় নীরব। নির্ঝরিণীর কোন চপল ধ্বনিও ধ্বনিত হচ্ছে না। আশ্চর্য, নতুন বউওয়ালা বাড়ী নীরব! অন্ততঃ দু-একটা গানের কলি বেরুলো না ঘর থেকে!

না-কি শ্রীমতী নির্ঝরিণী গৃহে নেই? পাশের বাড়ী বেড়াতে যায়নি তো? না-কি বাপের বাড়ী পাড়ি দিয়েছেন? আর জেনে শুনে অশোকস্তম্ভ এই 'বউ-নেই-বাড়ী'তে এনে হাজির করেছে আমায়!

অশোক চন্দ্রকে এ সম্পর্কে কিছু বলবো বলে তার দিকে তাকাতেই ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে নিষেধ ক'রে, ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বললো। নীরবেই অনুসরণ করলাম। বেশ ডিটেকটিভ বইয়ের সঙ্কটময় অবস্থার মতো লাগছিলো। তেমনি ইঙ্গিতে অশোকস্তম্ভ আমাকে পাশের ঘরে বসতে বললো।

বেশ সাজানো গোছানো ঘর। ইস্তিরী ঘরে থাকলে যেমন করে গোছানো থাকা স্বাভাবিক ঠিক তেমনটি।

আমাকে বসিয়ে রেখে অশোকস্তম্ভ রণস্থলে প্রবেশ করলো।

রণস্থলে প্রবেশ করলো কথাটা একটু পরেই বুঝেছিলাম। পানিপথেই বলা যেতে পারে। পানি গ্রহণের পর যে পথ সৃষ্টি হয় সেই পথেই।

অশোকস্তম্ভ পাশের কামরায় প্রবেশ করার সময় ভেজানো দরজাটা খুলে ঢুকেছিল। আর সেই সুযোগেই আমার দৃষ্টিটা ছিটকে ঐদিকে পড়েছিলো। দেখলাম শ্রীমতী হিমালয় শয্যায় পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। পরনে নীলাম্বরী, বিস্রস্ত বসন। এমন সর্বস্বান্ত হয়ে শোয়া আমি একবার মাত্র দেখেছিলাম। তাও ছবিতে। রামায়ণের কৈকেয়ী রাজা দশরথের কাছে বর চাইবার আগে ঢং করে ঠিক এমনি ভাবেই শুয়েছিলেন। তিনি অবশ্য গোঁসাঘরে শুয়েছিলেন। তখনকার দিনে রাজারাজড়াদের ক্রোধাগার থাকতো। নবাবী আমলে তাকে বলা হতো গোঁসাঘর। এ-যুগে শোবার ঘরই

যোগাড় করা মুশকিল, তাই শোবার ঘরই গোঁসাঘর, ভাঁড়ার ঘর সব কিছু।

রামায়ণের যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম কিনা আমি মনে করতে পারছিনে এই মুহূর্তে। তবে এই কলিযুগে, আমি সেই কৈকেয়ীর ছবি দেখেছিলাম। আর এই দেখলাম।

এর পর দরজা আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং এর পব আর দেখলাম না, একটু পবেই শুনলাম।

—হিমু—ও হিমুল, হিমালয়, হিমালয় নির্ঝর, নির্ঝরিণী, একটু নয়ন মেলো নয়নমণি!

ইস্—স্, মনে হলো পাশের কামরায় তু'শ বছব আগেকাব প্রাচীন কবিয়াল গোঁজলা গুঁই মশায অশোকস্তম্ভের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। এক কার্টুনিস্ট বন্ধুর একটা ছবি দেখেছিলাম—কর্তা তাঁব স্ত্রীকে আদর করে ডাকতেন, ও পুঁটি, আমার মৃগেলমণি ইত্যাদি বলে। গৃহিণীব তাতে খুবই অভিমান। অভিমান করে স্বামীকে বলছেন—পাশের বাড়ীর বকুলফুলের বর বকুলফুলকে আদর করে ডাকে, ও আপেল, আমার নাসপাতি। তুমি কেবল ডাকো পুঁটি আর পুঁটি। কর্তা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—আরে তোমার বকুলফুলের বর, রসকদম্ব বাবুব যে ফলের ব্যবসা, আর আমাব হচ্ছে মাছের। তাই মাছেব নাম গুলোই আমার বেশী মনে পড়ে।

অশোকস্তম্ভের মুখ থেকে যে সম্বোধন আমি শুনেছিলাম তা কেবল সে বাংলার ছাত্র বলেই। আশ্চর্য নয়, বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে নিয়েছে।

অহো, এই কি সেই চল্লিশ ইঞ্চি বুকেব ছাতিওয়ালা সের' ছাত্র শ্রীঅশোকস্তম্ভ চন্দ! অথবা চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতিওয়ালারাই এরকম হয়ে থাকে!

আমাদের কালীপদ নাজিরবাবু বলতেন, যে যত নাস্তিক, পরবর্তী-কালে সে ততখানি আস্তিক হয়। এই সুত্র অনুসারেই জাঁদরেল

পুলিশ কর্মচারী, বাঘা হাকিমরা শেষ জীবনে অনেকেই সন্ন্যাসী নিদেন পক্ষে বৈষ্ণব বাবাজী হন। অন্ততঃ শাস্ত্র পাঠাদি করে যে দিন কাটান—এরকম নিদর্শন অপ্রচুর নয়।

কিন্তু এমন 'তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুণা' হয়েও কি কূল রক্ষা করতে পেরেছিলো অশোক চন্দ! তা যে পারেনি পরমুহূর্তে তার ফয়সালা হয়ে গেলো। চক্ষুর নয়, কর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়ে গেলো আর কি! মানভঞ্জনের গাওনা শোনার পরই।

—থাক্, আর সস্তা সোহাগে কাজ নেই মশাই। তোমাদের ভালবাসা তো ইয়ের মুরগী পোষার সমান। বললাম, সিনেমায় যাব, তা একখানা মনের মতো শাড়ী কিনে আনতে পারলেন না গা। একই শাড়ী পরে দুদিন বেরুতে হবে আমায়! তখনই বলেছিলাম, কাজ নেই বিয়ে করে, পুষতে পারবে না আমায়। হলো তো! পৌষ মাস আমার আগেই বুঝলে তো! চৈত্রমাসে না জানি কী করবে!

রীতিমত চৈতালি সুর হিমালয় নির্ঝরিণীর। পৌষ মাসেই নির্ঝরিণীতে জল থাকবে না ভাবিনি আমি। কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ কথাটা দেখছি খাঁটি। খেটে যায় অশোকস্তম্ভের বেলায়। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ না করার ত্রুটি বোঝ এবার!

অবশ্য বাংলার ছাত্র অশোকস্তম্ভ বলতে পারতো,

'যুবতী ক্যান বা কর মন ভারি
পাবনা থ্যিকা আইনা দিমু
ট্যাহা দামের মটরি।'

কিন্তু না, তা বলেনি অশোক চন্দ। সম্ভবত, পাবনা পাকিস্তানের মধ্যে পড়েছে বলেই। কারণ কথা দিলেও পাকিস্তানে পাশপোর্ট করে যাওয়া এবং পাবনার 'ট্যাহা দামের মটরি' কিনে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। আর হিমালয়কে সেকথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া সম্ভব নয় কাজেই তার পরিবর্তে বলেছিলো—হিমুশ্বরী, প্রাণেশ্বরী আমার

বোশেখ মাসের কাসুন্দি আমার, পাশ ফিরে ছাখো বড়বাজার উজাড় করে তোমার জন্যে কত শাড়ী এনেছি ডারলিং! এতেও যদি তোমার পছন্দ না হয়, আরো শতখানেক নতুন ডিজাইন গরুর গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে আসবো। এতেও কি তোমার পোড়ার মুখে, মানে রাঙামুখে হাসি ফুটবে না!

দরজা ভেজানো। ভিতরের দৃশ্য দেখার সুযোগ ছিলো না। কিন্তু তাই বলে বুঝতে কষ্ট হলো না যে এর পর একটা আপোস মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে। ঐ সুতো দিয়েই বিচ্ছেদের ছেঁড়া কাপড় সেলাই করা যাবে। ঝগড়া বিবাদের একটা মজাই হচ্ছে, তা এক সময় মিটমাট হয়ে যায়। আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি কোন বিবাদ অনন্তকাল ধরে চলেছে, তা সে ছয় বছর ব্যাপী গোলাপের যুদ্ধই হোক, আর শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধই হোক। সে তুলনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো নস্যি। আর তাই যদি নস্যি, অশোকস্তম্ভের হিমালয়ে শান্তি পতাকা উড়োনো তো নস্যস্য নস্যি। বিশেষত, ঋষিরাও বলেছেন,

'অজা যুদ্ধে, ঋষি শ্রাদ্ধে, প্রভাতে মেঘডম্বরে
দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।'

লগুড় ক্রিয়া আরম্ভ হবার আগেই তার নিষ্পত্তি। অসমাপিকা ক্রিয়াই বলা চলে।

সুতরাং এর পর নিশ্চয়ই শ্রীমতী কিছু বলবেন। বলছিলেন হয় তো, কিন্তু শ্রীমতীরা কি সব সময় ভাষায়ই কথা বলেন? এমন ভাষা কি আজো সৃষ্টি হয়েছে যা শ্রীমতীদের ভাব প্রকাশের পক্ষে সব সময় দরকার হয়?

এর পরেই আমি আবার শ্রীমান অশোকস্তম্ভকে বলতে শুনলাম, —হ্যাঁ ছাখো লক্ষীটি, আর একটা কথা—আমাদের বন্ধু গোরাচাঁদ গড়গড়ী মশাই এসেচেন।

—কে? কে গড়াগড়ি দিয়ে এসেচে?

শ্রীমতীর জিজ্ঞাসা আমাকে মোটেই পুলকিত করে না। গড়গড়ীর সঙ্গে গড়াগড়ির ধ্বনিগত মিল ছাড়া আর কিসের সম্পর্ক, অ্যাঁ!

—না, না, গড়াগড়ি দিয়ে আসতে যাবে কেন? তুমি কি একটি তীর্থস্থান! আমার সঙ্গেই এসেচেন। হেঁটেই এসেচেন গোরাচাঁদ গড়গড়ী।

অশোকস্তম্ভকে আমার পক্ষে ওকালতি করতে শুনে আমি আশান্বিত হই।

—কেন মুখপোড়া এসেচে?

শ্রীমতীর কণ্ঠ। এর থেকে গড়িয়ে আসা অনেক বেশী সম্মানজনক ছিলো। হিমালয় তো একটা তীর্থস্থানই। কোলকাতার রাস্তা ঘাটেই তো তীর্থস্থান।

কিন্তু আমার মুখ পুড়িয়েও হিমালয় নীরব হয় না।

—আবার বুঝি কোন মিনসে টাকা ধার চাইতে এসেচে! তোমাকে কতদিন বলেছি-না, বাড়ীর সামনে একটা নোটিশ ঝুলিয়ে রাখতে, 'ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না'। তাতো তুমি করবে না! সেই ধার দেওয়া টাকাগুলো থাকলে আরো কতগুলো শাড়ী কিনতে পারতাম!

অশোক চন্দের চাপা কণ্ঠ আমার ঘরেও ভেসে আসে : আঃ, যারা টাকা নিয়েছে, নিয়ে পরিশোধ করেনি, তাদের এসব ভালো ভালো কথা বলো, তাতে দোষ নেই। কিন্তু ইনি গোরাচাঁদ গড়গড়ী। কবি মানুষ। গবিও বলতে পারো। ইনি কেবল গবিতা লেখেন। এঁর মতো কবি বা লেখক মানুষরা কী সুন্দর লোক হয় জানো নিশ্চয়ই। এঁরা তিলকে তাল করেন। তালকে পেয়ারা বলে চালান। সব সময়ই কেমন একটা 'সখি, ধর ধর' ভাব। কেমন সুন্দর, আগ্রহ আছে, অথচ উদাসীন। এ ছাড়া এঁরা সবজান্তাও হন। আশা করি, তোমারও ভালো লাগবে হিমলু। ওঁকে একটু চা জলখাবার দিয়ে অভ্যর্থনা করলে ভালো হয়। মানে, এই প্রথম তো তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেচেন কিনা!

—চা দেবো ! জলখাবার দেবো ! প্রথম আলাপ করতে এসেছেন ! লেখক মানুষ, অ্যাঁ ! ঝাঁটা মারো অমন নেখকের মাথায় !

হিমালয় নির্ঝরিণীর ঝর্ণা অফুরন্ত বেগে প্রবাহিত হতে থাকে। আর আমি গোরাচাঁদ গড়গড়ী, আমার কানের মধ্যে গরম শীসে বর্ষিত হতে থাকে। লেখকদের কিনা নেখক বলা ! অবশ্য অনেকে 'ল' কে 'ন', আবার 'ন' কে 'ল' বলে থাকে। নৌকাকে লৌকাও বলে কেউ কেউ।

কিন্তু এরপরও চা জলখাবারের আশায় বসে থাকা মানে বন্ধুবর অশোকস্তম্ভ চন্দকেই লজ্জিত করা। বিশেষ করে হিমালয়কে বাদ দিলে তো, সে সেই আগের অশোকস্তম্ভ। অবশ্য হিমালয়কে বাদ দিয়ে কি ভারতবর্ষকে ভাবা যায় !

চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছিলাম। ট্রাম রাস্তাটা যে এতদূর, যাবার সময় তা মনে হয়নি। তবু শেষ পর্যন্ত টলতে টলতে ট্রামে এসে উঠতে পেরেছিলাম। এবং একসময় আমাদের ডেরায় পৌঁছুতে পেরেছিলাম।

কিন্তু এখনও একটা কথা বলি নি। অশোকস্তম্ভের ওখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে যে কথা কয়টি কানে কানে ভেসে এসেছিলো, আর নেমে পেছন ফিরে যে দৃশ্যটি জানলা দিয়ে নজরে পড়েছিলো।

সে কথাটি না শুনলে, সে দৃশ্য না দেখলেই বুঝি ভালো ছিলো। কিন্তু বিধাতা পুরুষ কর্ণদ্বয় দিয়েছেন শ্রবণ করার জন্য, চোখ দিয়েছেন দেখতেই। জানি নে কোন ব্যক্তি প্রথম জিনিসটি আবিষ্কার করেছিলেন। সব কিছু আবিষ্কারকের নাম পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু কান দিয়ে না দেখে চোখ দিয়ে দেখা প্রথম আরম্ভ হলো কবে থেকে, কে জানে ! দুনিয়ায় অনেক কিছুই পাল্টাচ্ছে, কিন্তু খোদার উপর খোদকারী করার কথা এখনও ভাবছে না কেউ।

সেই চোখ আর কান, যা নাকি বিধাতা পুরুষ নিজ হাত দিয়ে গড়বার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাদের নিষিদ্ধ দ্রব্য দেখতে, নিষিদ্ধ কথা শুনতেই যেন বেশী আগ্রহ।

শ্রীমতী হিমালয়কে বক্ষে ধারণ করে, হাসতে হাসতে বলেছিলো অশোকস্তম্ভ (হ্যাঁ, যে অশোক চন্দকে এতক্ষণ পরমবন্ধু বলে, ভারতবর্ষ বলে মনে হয়েছিলো), জব্বর বুলেট ছেড়েছ ডারলিং। আর কোন দিন এ পথ মাড়াবে না। হতভাগাদের জ্বালায় মারাপড়ার যোগাড় আর কি ? আবার বলে কিনা, তোমার বাসায় নিমন্ত্রণ করলে না !

শ্রীমতী নির্ঝরিণী পাদপূরণ করেছিলেন : আবার কিনা চা জল খাবার আশা ! আমাদের বলে কিনা, এদিকে সিনেমার টিকেট কাটা রয়েছে, অ্যাঁ। নাও, তুমি দাড়ি কামিয়ে তৈরী হয়ে নাও গে।

অশোকস্তম্ভ আরো বলেছিলো : আরও বলে কিনা, তোমার চোখে টর্চের আলো ফেলবে। আমার শালী শালাজদের কাছে কান-লাল-করা কথা বলবে।

হিমালয় বলেছিলেন : তাই নাকি ? চলতো সার্চ করে আসি সার্চলাইট দিয়ে। কান লাল করে দিয়ে আসি একটু। আছে নাকি এখনও তোমার বন্ধু ?

না, আমি ছিলুম না। অনেক দিন পর একশ' মিটার রেস আবার দিয়েছিলাম। ঐ সঙ্গে মনে হয়েছিলো, ট্রাম রাস্তাটা যে এতদূর যাবার সময় তা মনে হয় নি।

পরদিনই মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে আমাদের জরুরী সভা বসেছিলো। গঙ্গাধর গাড়ুই মশাই সভাপতি হিসেবে বললেন : মাননীয় সদস্য, শ্রীগোরাচাঁদ গড়গড়ী মশাই, আপনি আপনার লাঞ্ছনার ইতিহাস বিবৃত করুন।

নিজের প্রশংসা নিজে যদিও করা যায়, এবং আমরা কেউ কেউ নিজের ঢাক নিজেও পিটিয়ে থাকি (মহাভারতে আত্মপ্রশংসা চিত্ত-

শুদ্ধির উপায় হিসেবে গণ্য বলেই নাকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান অর্জুনকে বলেছিলেন, যে সময় অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে অপমান করেছিলেন), কিন্তু নিজের লাঞ্ছনার কাহিনী নিজ মুখে প্রকাশ করা বড় হৃদয়-বিদারক ব্যাপার।

জগতে কোন চুরি যদি প্রশংসাযোগ্য বিবেচিত হয়, তা হচ্ছে কীল চুরি। মানে কীল খেয়ে কীল চুরি! আর এই চুরি আছে বলেই, সমাজটা আইন আদালতে ভরে যায় নি। সমাজের অনেক গণ্যমান্যদেরই এই বিদ্যায় পটু হতে হয়। নইলে গণ্যমান্য হওয়া মুশকিল। আবার কীল কেবল মাত্র আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত হয় না। ছেলেকে চোখের সামনে সিগারেট খেতে দেখে মান্যগণ্য বাপ ভিন্ন রাস্তায় চলেন, 'দেখিনি, দেখিনি' ভাব করে। এও এক ধরনের কীল চুরি। ছাত্র যখন আড়ালে আবডালে শিক্ষকের শ্রাদ্ধ করে, 'শুনিনি, শুনিনি' করে দ্রুত চলে যাওয়াও তাই।

তবু আমাকে মুখ খুলতে হলো। এবং করুণভাবে সভাকক্ষে আমার লাঞ্ছনার ইতিহাস বর্ণনা করতে হলো। আর সব কথা শুনে সকল সদস্যই হো হো করে গম্ভীরভাবে হেসে উঠলেন।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মশাই বললেন: হাস্য করা খুবই ভাল। সুস্বাস্থ্যের লক্ষণই এটা। অথবা স্বাস্থ্য ভালো থাকলেই হাস্য করা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলে, ব্যাপারটাকে তিল বলে মনে হবে না আপনাদের। তাল বলেই মনে হবে। শ্রীযুক্ত মাননীয় সদস্য গড়গড়ী মশায়ের অপমান অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। সেই লাভাস্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। অশোকস্তম্ভ ও তার দুর্বিনীতা পত্নী নির্ঝরিণী হিমালয়ের ব্যবহার অনুধাবন করুন। আপনাদের হাসি কান্নায় রূপান্তরিত হবে।

গিরি গোবর্ধন বর্ধনকে আমরা পাণ্ডা বলে থাকি। তিনি বললেন: সভাপতি মশায়, আমরা পরে কান্না করবো বলে আগে হেসে নিচ্ছিলাম। ঐ সঙ্গে শ্রীমতী হিমালয়ের বুদ্ধির প্রশংসা না

করে পারছিলাম না। ইতোপূর্বে আমার নিজের স্ত্রী ব্যতীত অপর কোন ইস্তিরীকে বুদ্ধিমতী ভাবার অবকাশ পাই নি। শ্রীমতী চন্দকে দেখে আমার আশা হচ্ছে।

চিত্ত বিমোহন দাস মশাই বললেন : আমি যদিও পাণ্ডাদের ছুচক্ষে দেখতে পারি নে, কারণ কাশী, গয়া, বৃন্দাবন এবং বৈদ্যনাথে তাদের সম্পর্কে আমার তিক্ত, মধুর, অম্ল সব রকমের অভিজ্ঞতা আছে : তবু জানতে চাইছি শ্রীমতী পাণ্ডার চুল খুব বড় কিনা। ইস্তিরীদের মাথার চুল যাদের যত বড় তাদের বুদ্ধি নাকি তত বেশী।

গোবর্ধন পাণ্ডা বললেন : আসলে আপনি আমার স্ত্রীকে কটাক্ষ করছেন। এই ধরনের বক্রোক্তি অতীব নিন্দনীয়।

চিত্তবিমোহন বললেন : কেন, কেন, কীভাবে আমি কটাক্ষ করলাম ?

পাণ্ডা বললেন : আপনি তাদের মাথায় গোবর পোরা আছে বলে কটাক্ষ করছেন। সভাপতি মশায় 'অর্ডার অর্ডার' বলে উভয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

সুনীল আকাশ চক্রবর্তী বললেন : মহিলা মাত্রেই চন্দ্রমুখী হয়ে থাকেন। এখানে অবশ্য চন্দমুখী বলতে পারেন। আমার মনে হয় বুদ্ধির ক্ষেত্রে এই চন্দাবৎদের আমরা সহজেই ঘায়েল করতে পারবো।

রবি বিষ্ণুপদ নন্দী বললেন : আমি এক সময় এক শত্রুর পাল্লায় পড়ে নাজেহাল হয়েছিলাম। সেই থেকে কোন শত্রুপক্ষকে আমি কম বুদ্ধিমান বলে ভাবি নে। বিশেষত, যদি সেই শত্রু কোন মহিলা হন।

বিমল সুগন্ধিবাবু বললেন : রবি বিষ্ণুপদ বাবু, আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধির সংজ্ঞা ও রীতি সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। তাহলে জানেন, ষোল বছরের পর আর কিছু বুদ্ধি বাড়ে না। যা বাড়ে তা হচ্ছে অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা লাভের দিক দিয়ে বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই বাণী দেবার

অধিকারী। তার মধ্যে যিনি যত বেশী দিন বিয়ে করেছেন, তিনি তত বড় বিশারদ।

হিমকল্যাণ গোঁসাই বললেনঃ আপনি কি তাঁদেরই বিবাহ বিশারদ বলতে চাইছেন?

।বিমল সুগন্ধি বললেনঃ এ ব্যাপারে আমাকে কটাক্ষ করা হয়ে থাকলে আমি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করছি।

কালীপদ নাজির বাবু বললেনঃ আহা-হা, এ ব্যাপাবে আপনি ক্রোধান্বিত হচ্ছেন কেন সুগন্ধি বিমলবাবু। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন, নারী পুরুষের কাছে তিন রকমের অভিব্যক্তি। এক রকম পুরুষের কাছে সিগারেটের মতো। এই টানলো, এই ফেললো। এক রকম পুরুষের কাছে নারী বর্মা চুরুটের মতো, তীব্র ঝাঁঝালো, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী। আর এক শ্রেণীর পুরুষের কাছে নারী অম্বুরী তামাকের মতো। ধীরে সুস্থে টানছে। সুন্দর আমেজে সারা দেহ মন আবিষ্ট। এ রকম স্ত্রী-ই কাম্য বলে অনেকে মনে করেন। আপনি যে তিনটি বিয়ে করবেন ভাবছেন, নিশ্চয়ই এই তিন দিকেই লক্ষ্য রেখে?

বিমল সুগন্ধি বললেনঃ ঠিকই বলেছেন নাজির বাবু। ভাল নজিরই দিয়েছেন। কারণ আমার দৃঢ় ধারণা এযুগে তিনটির কম বিয়ে করলে একজন ভদ্রলোকের চলে না!

জয় জগদীশ্বর বললেনঃ আপনাকে এখনও যে জেলের বাইরে রাখা হয়েছে এটাই আশ্চর্য বলে মনে হয়।

বিমল সুগন্ধি বললেনঃ আহা আপনারা অকারণে আমার প্রতি অবিচার করছেন। আমি বলতে চাইছি, গৃহস্থালীর কার্যাদি করার জন্য একজন স্ত্রীলোক দরকাব। এটা স্বীকার করেন কিনা? তাকে খেতে পরতে দিতে হয়তো! মাইনেও দিতে হয়! তার চেয়ে যদি সেই স্ত্রীলোকটি আমার এক নম্বর স্ত্রী হন আপনারা আপত্তি করবার কে?

সুকুমার কুমার বললেনঃ তাতো বটেই। এবার আপনার দু-নম্বর স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলুন।

বিমল সুগন্ধি বললেনঃ টাকা পয়সার হিসেব নিকেশ রাখার জন্য একজন স্ত্রী থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি আন্তরিক ভাবে স্বীকার করি। এবং আমার সঙ্গে বাইরে পার্টিতে যেতে, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ রক্ষার ব্যাপারে, মার্কেটিং এর জন্য একজন আধুনিকা স্ত্রী থাকার সার্থকতা সম্পর্কেও আমি দৃঢ়নিশ্চিত।

হিমকল্যাণ বললেনঃ কিন্তু আপনার এই ধারণা যদি ইস্তিরী পক্ষেও সংক্রামিত হয় তাহলে সেটা সমাজের পক্ষে বিতিকিচ্ছিরী কাণ্ড হবে না সুগন্ধি চক্রবর্তীবাবু?

বিমল সুগন্ধি বললেনঃ আপনারা সব ব্যাপারে অতীতের ঐতিহ্য নিয়ে টানাটানি করেন। অথচ মহাভারতের দ্রৌপদীর কথা ভেবে দেখুন, ভদ্রমহিলা পাঁচটা যে বিয়ে করেছিলেন, সে ঐ বিভিন্ন প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই। এবং তিনি বেড়াতে টেড়াতে যাবার সময় অর্জুন ছোকরাকে নিয়ে বেরুতেন। এজন্য অর্জুনকেই একটু বেশী ভালবাসতেন। ছোকরা বেশ একটু স্মার্ট ছিলো তো। স্বয়ং যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানে যাবার পথে দ্রৌপদীর দেহত্যাগের সময় একথা সবাইকে বলেছিলেন।

সভাপতি গঙ্গাধর গাড়ুই বললেনঃ মাননীয় সদস্যগণ যেরূপ প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করছেন, তাতে সভার কার্যের রীতিমত ব্যাঘাত হচ্ছে। আপনারা আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ গড়গড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তিনি কিরূপ বেদনার্তভাবে বসে আছেন।

সকল সদস্যই আমার বেদনার্ত মুখের দিকে তাকালেন। সেই মুহূর্তে আমি একটা বেদানা চিবুচ্ছিলাম, সুতরাং আমার মুখ যে বেদানার্ত ছিলো এ সম্পর্কে সন্দেহই ছিলো না।

সভাপতি মশায় বললেনঃ আমাদের মধ্যে কে আছেন যিনি গোরাচাঁদবাবু তথা আমাদের এই অপমানের প্রতিবিধান করতে সমর্থ?

সুনীল আকাশ বাবু বললেন : এ সম্পর্কে আমি আমাদের নতুন সভ্য পুলিশের এ. এস্. আই. মহোদয়কে অনুরোধ করবো, কীভাবে কাজ হাসিল করলে আইনত দূষনীয় হয় না, সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে। এজন্য আমরা, আইন আদালতও করতে পারি! অবশ্য এখানে আইন আদালত করাটা ঠিক হবে না। এজন্য আমাদের আদালতে যেয়েই আইন করতে হয়। সেজন্য উকিল মোক্তার লাগে। সব চেয়ে বড় কথা বেশ কিছু পয়সা লাগে।

রবি বিষ্ণুপদবাবু বললেন: এ সম্পর্কেও আমাদেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। আদালতের গাছগুলো পর্যন্ত পয়সা ছাড়া ছায়া দেয় না।

পুলিশেব এ. এস. আই জগন্নাথ সিং বললেন : হাঁ, হাঁ, পোয়সা বি কুছু লাগবে।

চিত্তবিমোহনবাবু বললেন : না আমবা আইন আদালত করতে ইচ্ছুক নই। গোবর্ধন পাণ্ডা মশাইকে আমবা এ ব্যাপাবে অনুরোধ করছি। বৈদ্যনাথ ধামে এক পাণ্ডা মাত্র পাঁচ সিকে পয়সা নিয়ে যে আধছটাকী মাটির শিশিতে পঞ্চগঙ্গাব জল (আসলে তা নাকি ইঁদারার জল) গছিয়েছিলো সেই থেকেই পাণ্ডাদেব বুদ্ধি সম্পর্কে আমি আশান্বিত। বাগাবার ব্যাপারে তাদের জুড়ি নেই বলেই আমার দৃঢ় ধারণা।

গোবর্ধন পাণ্ডা বললেন: আর রাগাবাব ব্যাপারে শ্রীযুক্ত চিত্তদাস মশাই।

—যা হোক আমি এ ব্যাপাবে পাণ্ডাগিবিই কববো। কিন্তু আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে কার্যোদ্ধার পর্যন্ত আপনারা সকলেই আমার কথার বাধ্য থাকবেন!

আমরা সকলেই মাথা নেড়ে এ প্রতিশ্রুতি দিলাম।

গোবর্ধন বললেন: আর এক কথা, মনে রাখবেন আমাদের পরিকল্পনা পাঠিকাদেরও জানতে দেওয়া হবে না। কারণ পাঠিকা

মাত্রেই আজকাল ভয়ানক সেয়ানা। তাঁরা জানতে পারলে, আমাদের পরিকল্পনা বানচাল হতে বাধা থাকবে না।

চিত্তবিমোহন বললেন: কিন্তু আমি আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী অনামিকা দেবীকে না জানিয়ে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। মহিলা-প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকে তিনি যে ভাবে সংসার-রাজ্যপাট চালাচ্ছেন, তাতে আমি মুখে কিছু না বললেও, ডুবুরী নামিয়ে আজকাল কথা বের করে নেবেন।

গোবর্ধন পাণ্ডা কৃপার দৃষ্টিতে চিত্তবিমোহনের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন: আমরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা দ্বারা ঠিক করবো, হিমালয়স্তম্ভ সম্পর্কে কী করা যায়। এবং সেখানে কোন সাংবাদিকেরও প্রবেশ অধিকার থাকবে না। সাংবাদিকেরা সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক হন। গোপন কাহিনী ফাঁস করতে তাঁদের জুড়ি নেই।

মুখার্জি বিনয়কৃষ্ণ বাবু বললেন: ঐ সঙ্গে চিত্তবিমোহন বাবুর প্রবেশাধিকার সম্পর্কে আমার একটা মুলতবি প্রস্তাব আছে। তিনি যদি শ্রীমতী অনামিকা দেবীকে জানান এবং কাউকে না জানাতে বলেন, তাহলে শ্রীমতী অনামিকা কনিষ্ঠা শ্রীমতী কুমকুম সুবেশাকে জানাতে পারেন। অবশ্য তিনিও অপর কাউকে না জানাতেই বলবেন। এর ফলে সারা কোলকাতাবাসীর আমাদের পরিকল্পনা জানার অসুবিধে থাকবে না। চাই-কি কুমকুম সুবেশাকে যদি হিমালয় পাদদেশে দেখা যায়—আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সভাপতি মশায় বললেন: কথাটা প্রণিধানযোগ্য। আগেকার দিনে সংবাদ দ্রুত প্রচারের জন্য মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হতো কিনা আমি জানিনে, তবে এযুগে আমরা লক্ষ্য করেছি ইস্তিরী মাত্রেই একটি অয়ারলেস্ যন্ত্র বিশেষ।

গিরিগোবর্ধন পাণ্ডা ঠাণ্ডা মাথায় বললেন: এজন্য মাননীয় সভাপতি মশায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। মাননীয় সদস্যও নিশ্চিন্ত

থাকবেন। মহিলাগণ আমাদের দেশে এই প্রথম মন্ত্রী হলেন না। অতি প্রাচীন কাল থেকেই তাঁরা সংসার রাজ্যে মন্ত্রী। সংসারের সব কটা পোর্টফোলিওই তাঁদের .হাতে। এখন যদি ইনটেলিজেন্স বা স্পেশাল ব্রাঞ্চের ভারও তাঁদের হাতে যেয়ে থাকে সেটা খারাপ কিছু নয়। মিস্ মেয়ো—যিনি ভারত সম্পর্কে বই লিখে কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি একটা সাচ্চা কথা বলেছিলেন—চাকুরী ক্ষেত্রে প্রার্থীরা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে নেবে, এই নিয়ম করা নাকি ভালো। দরকার বোধ করলে আমরা চিত্তবিমোহন বাবুকে একদিন বন্দী করে রাখবো।

হিমকল্যাণ গোঁসাই বললেনঃ কৃষ্ণবিনয় বাবু বলেছেন কোলকাতাবাসীরা আমাদের পরিকল্পনা জানতে পারবে, কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি কুমকুম সুবেশা কিছুতেই হিমালয়ে যাবেন না। ইস্তিরী মনস্তত্ত্বের অ আ ক খ সম্পর্কে যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা বলেন, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মহিলা মাত্রেই অপর মহিলাদের শত্রু ভেবে থাকেন। সুতরাং এই বিশেষ ক্ষেত্রে কুমকুম সুবেশা দত্ত, নির্ঝরিণীতে আর যাই হোক—চান করতে নামবে না।

সুতরাং এর পর চিত্তবিমোহন বাবুর রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশের আর কোন বাধা রইলো না। বাধা রইলো আমি শ্রীগোরাচাঁদ গড়গড়ীর পক্ষে। যদিও আমার সাংবাদিক হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, এমন কি আমাকে লেখক হিসেবে গণ্য করলে, আমাদের পাড়ার করঞ্জাক্ষ পাঠককেও লেখক বলতে হয়। কারণ তিনি রেজেস্ট্রী অফিসে দলিল লেখেন। কিন্তু আমার এই সব সারগর্ভ যুক্তি গৃহীত হয়নি। সুতরাং রূদ্ধদ্বার কক্ষে সদস্যদের যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, তার কিছুই আমি প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারিনি। তবে এ রকম ক্ষেত্রে সংবাদিকগণ 'ওয়াকিফহাল মহল', 'বিশ্বস্তসূত্র' প্রভৃতির শরণাপন্ন হন এবং কিছু না কিছু অবগত হনই। সভার কোন্ কোন্ সদস্য হাসিমুখে বেরিয়েছেন, কোন্ সদস্য গম্ভীর মুখে বেরিয়েছেন, তা থেকেও তাঁরা

আন্দাজ করে নেন। তারপর কিছু পরিমাণ সদস্য থাকেন, তাঁরা সাংবাদিকদের কিছু বলার (প্রথমে অবশ্য না বলার ভান করে) লোভও যে সম্বরণ করতে পারেন না এটাও সাংবাদিকদের অজানা নয়!

সুতরাং আমার পক্ষে অনুমান করা কষ্ট হয়নি, শ্রীমতী হিমালয়কে নয়, শ্রীমান অশোকস্তম্ভকে যে ভাবে হোক ক্লাবে ধরে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

অবশ্য এজন্য আমাকে বিমল সুগন্ধি বাবুর শরণাপন্ন হতে হয়েছিলো। তাঁর ত্রি-গৃহিণী ফরমূলার প্রশংসা করতে হয়েছিলো। মহাভারতের দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীতে তুষ্ট না হয়ে ষষ্ঠ স্বামী হিসেবে মহাবীর কর্ণকে বাসনা করেছিলেন, এ সম্পর্কে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদির সম্মুখে তাঁর স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করেছিলাম। এমন কি আধুনিক কালে এক পাশ্চাত্ত্য মহিলা পঞ্চ স্বামী চেয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তার কথাও আমি ভাবী-সাংবাদিক হিসেবে উল্লেখ করতে ভুল করিনি।

বিমল সুগন্ধি বাবু এ সব কথায় খুশী হলেন। তারপর একান্তে বললেন: কাউকে বলবেন না, তিন নম্বর ইস্তিরী আমি ঠিক করেই রেখেছি, এ সম্পর্কে কুমকুম সুবেশাকেই একটা চান্স্ দেবো ভাবছি।

অশোকস্তম্ভকে যে কোন ভাবে ক্লাবে ধরে আনা হবে, একথা আমি বিমল সুগন্ধির কাছ থেকে শুনেছিলাম। আর, একদিন তা করা হলোও। কী ভাবে তাকে হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে ধরে আনা হয়েছিলো তা আমাকে জানতে দেওয়া হয়নি। তবে ধরে আনার পরের মিটিংএ আমাকে কৃপাবশতই প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। আসলে স্টেট্ বনাম আসামীর কেসে যেমন বাদীকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয়, আমাকেও তেমনি ডাকা হয়েছিলো মাত্র।

সেদিন শ্রীঅশোকস্তম্ভ চন্দ—পিতা শ্রীচন্দ্রচরণ চন্দ, হাল সাকিন কোনালকান্তি কোদক লেন, জেলা কলিকাতা, বয়স তেইশ বছর

তিনমাস নামক ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জসীট তৈরী করা হয়েছিলো। ক্লাবের সতেরোর উপধারা অনুসারে তা অশোকস্তম্ভ চন্দ পিতা শ্রীচন্দ্রচরণ চন্দকে শোনান হয়েছিলো।

প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছিলো, ক্লাবের প্রতি শ্রীঅশোকস্তম্ভ চন্দ পিতা শ্রীচন্দ্রচরণ চন্দ, হাল সাকিন, কোনালকান্তি কোদক লেনের কীরূপ আনুগত্য ছিলো। অপরাধী বলে অনুমান করা ব্যক্তি কীভাবে অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্লাব ত্যাগ করে প্রথম অপরাধ করলো। কীভাবে অসামাজিক প্রক্রিয়ায়, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ পর্যন্ত না করে, একা একা বিয়ে করলো (অবশ্য এখানে আমার মনে একটা খটকা যে না জেগেছিলো তা নয়। বিয়েটা যতদূর মনে হয় একা একা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ উভয় পক্ষই একা একা বিয়ে করে। এই দুই মিলে একাত্ম হয়। দুয়ে মিলে তিন চার পাঁচ হয় শুনেছি। সে অঙ্কের ব্যাপার। আমি গোরাচাঁদ গড়গড়ী অঙ্কে বরাবরই কাঁচা। এজন্যে আই. এস-সি তে আমার অঙ্ক ছিলো না)।

এরপর শ্রীঅশোকস্তম্ভ পিতা শ্রীচন্দ্রচরণ চন্দ, জেলা কলিকাতা কী ভাবে ক্লাবের একজন মাননীয় সদস্য শ্রীগোরাচাঁদ গড়গড়ী হাল সাকিন দেগঙ্গা, জেলা ২৪ পরগণা মহাশয়কে স্ত্রীর মুখ দেখার নিমন্ত্রণ করে নিয়ে কি রকম নিখুঁত ভাবে অপমান করলো তার নিখুঁত বর্ণনা (অবশ্য এখানেও আমার একটা খটকা লেগেছিলো। পরস্ত্রীর মুখ দেখা বা পরকুমারীর মুখ দেখা সমাজ স্বীকৃত নয়! আপনি যে ইচ্ছে করলেই অপরের স্ত্রীর মুখ দেখবেন, স্ত্রীওয়ালারা সে সুযোগ দেবেন বলে মনে হয় না। কোন কুমারী কন্যার মুখের দিকেই যে আপনি তাকাবেন তাও আপনার পৃষ্ঠের পক্ষে অনুকূল নয়। তবে একটা সময়ে এ সুযোগ সমাজ দিয়ে থাকে। তাকে 'বউ দেখা' নাম দেওয়া হয়। তখন আপনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বউএর (তা যার বউই হোক) মুখ দেখতে পারেন। এমন কি দেখতে দেখতে আপনি নিন্দে প্রশংসা (শেষেরটাই সাধারণতঃ প্রকাশ্যে করে যাবেন) সবই করতে

পারেন। অবশ্য সেজন্য আপনাকে কিছু দর্শনী দিতে হবে। আংটি শাড়ী, গয়নাও দিতে পারেন, অথবা আমার লেখা পাঁচসিকে দামের বই দিয়েও বউ দেখতে পারেন। (এর থেকেও কমদামের বই আমার আছে, কিন্তু ব্যাকরণ বা ইতিহাস বই দিয়ে বউ দেখা যাবে কিনা সেটা অবশ্য আপনার ব্যাপার)।

এর পরের অংশে অশোকস্তম্ভ, পত্নীর নাম হিমালয় নির্ঝরিণী সম্পর্কে সরাসরি চার্জ করে বলা হয়েছিলো, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভদ্রলোকদের অপমান করার যে বিধিসম্মত উপায় লিপিবদ্ধ আছে, সেভাবে মাননীয় সদস্য গোরাচাঁদ গড়গড়ীকে অপমান করলে, চাই কি সে আইন অনুসারে শ্রীগোরাচাঁদকে গোর দেবার ব্যবস্থা করলেও এই সভা তাতে হস্তক্ষেপ করতো না। কোলকাতা, ২৪ পরগণাকে অপমান করলেও তাকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে রূপ দেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু একটি মেয়েছেলে (শুধু ছেলে হলেও একটা কথা ছিলো) দিয়ে একজন মাননীয় সদস্যকে অপমান করার কোন এক্তিয়ার অশোকস্তম্ভের নেই। বিশেষত, অশোকস্তম্ভ তাকে বিয়ে না করলে, তাকে একটা মেয়ে ছাড়া কীই বা বলা যেতে পারতো। কারণ বিয়ের আগে মেয়েদের, মেয়েছেলে বলে অভিহিত করার সামাজিক রীতির কথা জানা যায় না। বিয়ের আগে মেয়েরা ফ্রক পরা ছাড়তে চায় না বলেই বর্তমান প্রগতিবাদ সমীক্ষা করে দেখেছে। সুতরাং আই.এ. পড়া মেয়ে আর ফ্রক-পরা মেয়েতে কোন পার্থক্য আছে বলে সদস্যগণ মনে করেন না।

অশোকস্তম্ভ এতক্ষণে তার গ্রেপ্তারের কারণ অবগত হলো। এতক্ষণ তার ধারণা ছিলো সে সত্যই কোন গুণ্ডাদলের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং গুণ্ডারা যেমন ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায় করে, তার বেলায়ও তাই করা হবে।

অশোকস্তম্ভ এক সময় গুণ্ডাদের ভয় করতো না। গুণ্ডা পেলেই

ঠাণ্ডা করার জন্য তার হাত নিশ্‌পিশ্‌ করতো। কিন্তু বিয়ে করার পর তার সে সাহস অনেক বিবাহিত পুরুষের মতোই ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিলো। এমন কি তার ঘরে চোর ঢুকলেও সে চোরকে বরং একটা সিগারেট অফার করবে, তবু তাকে ধরবার চেষ্টা করবে না। এ সম্পর্কে তার বর্ধমানের মেসো-শ্বশুর বা হিমালয় নির্ঝরিণীর প্রভাব কতখানি ছিলো আমরা বলতে পারবো না।

যা হোক, অশোকস্তম্ভ চন্দ তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিলো। এমন কি অন্যান্য আসামীদের মতো, হুজুর আমি নির্দোষ, ষড়যন্ত্র করে আমাকে মামলায় জড়ানো হয়েছে, এসব বলে আত্মপক্ষ সমর্থন পর্যন্ত করলো না। বরং বললো ঃ ইয়ে, আমাকে এবার ছেড়ে দিলে আমি হিমলুর জন্য তিন প্যাকেট চানাচুর কিনে নিয়ে যেতাম। শ্রীমতী হিমনির্ঝর নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে চানাচুরের প্রত্যাশায় বসে আছেন। আপনারা যাঁরা বিবাহিত, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, বিবাহিতা ভদ্র মহিলারা কী পরিমাণ টক. ঝাল, নোনতা জাতীয় খাবারের প্রতি আসক্তা হন।

সভাপতি গণপতি গুড় মশাই বললেন ঃ (না, গণতন্ত্রের সম্মান রাখতে আমাদের এক এক সভায় এক একজন সভাপতিপদে বৃত হয়ে থাকেন। এমন কি কোন মহিলা আমাদের ক্লাবের সদস্য হলে, তিনিও পর্যায়ক্রমে সভাপতি হবেন। এজন্য তাঁর সভাপত্নী হবার প্রয়োজন নেই), আসামী অশোকস্তম্ভ চন্দের ধৃষ্টতা ও সভার প্রতি অবমাননা উভয়ই আপত্তিকর। এটা সভা-আদালত অবমাননা করার সঙ্গে তুলনীয়।

সভাপতি মশায়ের বক্তব্য শেষ হবার পর সদস্যগণ অশোকস্তম্ভ চন্দকে বিভিন্ন প্রকার ভয় দেখাতে লাগলেন।

চিত্ত বিমোহন দাস বললেন ঃ জানো, তুমি আমার শ্যালিকার প্রতি যে হৃদয়হীন আচরণ করেছ তাতে তোমার নামে একটি হৃদয়ভঙ্গের মামলা আনা যায়। এর থেকে কম হৃদয়হীন আচরণ করলেও

'পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি' শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে তা জানো! অবশ্য তোমার হৃদয় আছে বলে আমার মনে হয় না।

সুনীল আকাশ চক্রবর্তী বললেন: বিয়ের পর হৃদয় থাকে না বলেই ন্যায়শাস্ত্র মতে বলা যেতে পারে। কলাশাস্ত্র মতে হৃদয় সমর্পণই বিবাহ। সুতরাং অশোকস্তম্ভ তার হৃদয় হিমালয়ে নির্বাসন দিয়েছে। অশোকস্তম্ভের যে হৃদয় সেটা হিমালয়ের সমর্পিত হৃদয়। সুতরাং মেয়েদের হৃদয় আর কত উঁচুদরের হবে আপনারাই বলুন।

চিত্তবিমোহন তাঁর পূর্বকথায় ফিরে বললেন: তুমি আমার শ্যালিকা কুমকুম সুবেশাকে অবলা সরলা পল্লী-বালিকা পেয়ে, চৌদ্দ দিনের সিনেমা, সতেরো দিনের রেস্তোরাঁর পয়সা মেরেছো। তোমাকে আমি পুলিশে দেব ভাবছি। নয় তো, আমার শ্যালিকা কুমকুম সুবেশার হাতে দেব ভাবছি।

বিমল সুগন্ধিবাবু মৃদু আপত্তি তুলে বললেন: (কী জন্যে বললেন, সেটা অবশ্য কেবল আমিই জানি). আহা-হা, চিত্তবিমোহন বাবু, আমার মনে হয় ওকে পুলিশে দেওয়াই ভালো। নয়ত আমার পাড়ার মস্তানদের সিনেমার পয়সা দিলে তারাও পুলিশের চেয়ে বেশী কাজ দেখাতে পারবে। মিছিমিছি সুবেশা কুমকুম দেবীকে এই সমস্ত ন্যাস্টী ব্যাপারে জড়ানো ঠিক হবে কি?

অশোকস্তম্ভ শ্যালিকা এবং পুলিশ দুটোকেই যে এমন ভয় করে তা আমরা আগে জানতুম না। সভাপতি মশায়ের দিকে তাকিয়ে বিনীতকণ্ঠে বললে: মি লর্ড, আমি চিত্তবিমোহন বাবুকে বরং ঐ ক'দিনের সব টাকা শ্রীহিমনির্ঝরিণীর কাছ থেকে আদায় করে দেবোখন, কিন্তু আমাকে পুলিশ শ্যালিকার হাত থেকে, আই মীন্, শ্যালিকা পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে আজ্ঞা হয়।

চিত্তবিমোহন দাস ফরিয়াদি পক্ষের উকীলের মতো শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন: কিন্তু ভাঙ্গা হৃদয় কী ভাবে জোড়া লাগবে! আপনি

যদি সজ্জন ব্যক্তি হন তাহলে জানেন এক তেঁতুল পাতায় দশজন সজ্জন বসতে পারেন কিন্তু হৃদয়ের আসনে দশজনের স্থান হওয়া সম্ভব নয়—সমাজসম্মতও নয়। বিশেষতঃ হৃদয়ের মৃৎপাত্রে একবার চিড়্ খেলে সিমেণ্ট দ্বারাও তা জোড়া লাগান যায় না। আমার শ্যালিকার চিত্তে আপনার চিত্তহীন ব্যবহারে যে পরিমাণ ফাটল ধরেছে, তা ভরাট হবার কোন আশু সম্ভাবনা নেই। অনেক সময় ভাড়াটে বাড়ীর কোন না কোন ছোকরা দ্বারা এই সব ফাটল ভবাট করা হয়ে থাকে, গানের মাস্টার বা ছোকরা টিউটর দিয়েও কোন কোন সময় এর্ং বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হযে থাকে।

বিমল সুগন্ধি বাবু বললেনঃ যদিও কাক ছড়ালে ভাতের অভাব মানে ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয না, আপনার শ্যালিকা সে তুলনায পোলাও, এবং এজন্য কাশ্মীরের হরিশ্চন্দ্র কাক পর্যন্ত পাণিপ্রার্থী হওয়াও আশ্চর্য নয়। এমন কি যে কোন চক্রবর্তীও এ উদারতা দেখাতে পারেন। তবু এই হৃৎপিণ্ডহীন ব্যক্তিকে পুলিশে দেওয়াই আমি উচিত বলে মনে করি।

পুলিশের এ. এস. আই জগন্নাথ সিংজী সিংহ গর্জনে বললেনঃ হুঁ বহুৎ খুব কাম হোবে তাহোলে। হামার হাতে ছাড়িয়া দিলে হামিও ব্যাবোস্থা করতে পারি। হোমোপ্যাথি ডোজে কাম ভি না হোলে অ্যালোপ্যাথি ভি চালান হোবে।

সমস্ত সদস্যগণ কেহ ব্যাঘ্র, কেহ সর্প গর্জনে একথা সমর্থন করলেন।

এরপর স্তম্ভকে ঠেকানো গেলো না। এই প্রবল ভূমিকম্পে সে ধরাশাযী হলো। পুলিশ যে মণ্ডল কংগ্রেসের সম্পাদককেও ছাড়ে না, কিছুদিন আগে খবরের কাগজে সে দেখেছিলো। সুতরাং সম্রাট অশোকের নামের নাম হলেও যে তাকে ছাড়বে না এ সম্পর্কে তার কোন সংশয়ই রইলো না। আর সম্রাট অশোকই যদি বিপদগ্রস্ত হয়, স্তম্ভ ভগ্ন করতে আর কয় সেকেণ্ড সময় লাগবে!

সুতরাং ভগ্ন কণ্ঠেই অশোকস্তম্ভ বললো : মাননীয় সভাপতি মশায়, আমি বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করছি। এখন আমাকে নিয়ে আপনারা যা বলবেন আমি তাই করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সভাপতি মশায় বললেন : বেশ, তাহলে আমাদের আর একবার রুদ্ধদ্বার কক্ষে যাবার প্রয়োজন।

এরপরই দ্বার রুদ্ধ করে সেই ঘরকেই রুদ্ধদ্বার কক্ষ করা হলো। আমার এতদিন ধারণা ছিলো, রুদ্ধদ্বার কক্ষ বোধ হয় আলাদা থাকে এবং কোন বিশেষ উপায়ে সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশ করা হয়। শার্সী বা ভেন্টিলেটর দিয়ে প্রবেশ করা হয় বলেও আমি কল্পনা করতাম। কিন্তু চোখের সামনে দ্বার রুদ্ধ-কক্ষ তৈরী করা যেতে পারে তা আমি এই প্রথম দেখলাম। কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে আমাকে সেই দ্বার রুদ্ধ করার আগেই বের করে দেওয়া হয়েছিলো। না, শার্সী ভেন্টিলেটর দিয়ে নয়, দরজা পথেই। এই সুযোগে আমি সামনের দোকানে এক কাপ চা নিয়ে বসেছিলাম। দৃষ্টি অবশ্য রুদ্ধদ্বারের দিকেই ছিলো।

এর প্রায় মিনিট পনেরো পর যখন সকল সদস্য বেরিয়ে এলেন তখন দেখা গেলো শ্রীমান অশোকস্তম্ভের মাথায় নিটোল ভাবে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চুল এলোমেলো। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। জামা কাপড় বিধ্বস্ত।

তবে কি ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্যগণ অশোক চন্দকে আড়ং জাতীয় ধোলাই দ্বারা আপ্যায়িত করেছেন! নাকি বিশেষ প্রক্রিয়ায় 'বারকোশ' বানিয়ে ছেড়েছেন! আমি আরও অথৈ জলে পড়লাম. যখন দেখলাম সম্ভাব্য নির্যাতনের ফলে যে পরিমাণ কাতরোক্তি বেরুবার কথা, অশোকস্তম্ভের মুখ থেকে তা বেরুচ্ছে না। অবশ্য যে কোন খাওয়া, তা পেটেই হোক আর পিঠেই হোক, খাওয়া প্রথম পর্বেই যা অনুভূতিতে সাড়া জাগায়। ক্রমে ক্রমে তা অনুভূতি বাইরে চলে যায়। রসগোল্লা নাকি তখন ঘুঁটের মতো লাগে

মার যে খায় তার নাকি কোন সাড়্ই থাকে না। আমি অবশ্য রসগোল্লা বা মার কোনটাই ভরপেট খেয়ে দেখিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি গাড়ী এনে দাঁড় করানো হলো। ক্লাবের কতিপয় বলিষ্ঠ সদস্য শ্রীমান অশোকস্তম্ভকে চ্যাংদোলা করে এনে গাড়ীতে উঠলেন। সভাপতি মশায় আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কিছু নির্দেশ দিলেন। পরক্ষণেই গাড়ীর একপাশে আমাকেও বসিয়ে দেওয়া হলো। না হলে এই শেষ পর্ব লেখার জন্য আমাকে ওয়াকিফহাল মহলের শরণাপন্ন হতে হতো।

সন্ধ্যে ঠিক ছ'টা বেজে সাড়ে বাহান্ন মিনিটের সময় আমরা আবার সেই পথে কোনালকান্তি কোদক লেনের সেই বাড়ীতে প্রবেশ করেছিলাম। হিমালয় প্রদেশেই বলতে গেলে। পাঠানদের সম্পর্কে একটা দুর্নাম রবিবাবু দিয়েছেন, তারা নাকি যে পথ দিয়ে আসে সে পথ দিয়ে আর ফেরে না। কিন্তু গড়গড়ীদের সম্পর্কে তিনি কোন অপবাদ প্রদান করেন নি। সুতরাং আমি শ্রীগোবাচাঁদ গড়গড়ী সেই পথ দিয়েই দুতলায় উঠেছিলাম।

উঠে কলিং বেল টিপে বলেছিলাম : দেখুন, বাড়ীতে কে আছেন ?

যেন আমি আর জানিনে, অশোকস্তম্ভ ছাড়া বাড়ীতে আব কে থাকতে পারেন ! পরমুহূর্তেই হিমালয়ের আবির্ভাব ঘটেছিলো। পকেটে আংটি, কানপাশা থাকলে এই সুযোগে আমি 'বউ দেখা' দেখে নিতে পারতাম। বাধ্য হয়ে বিনে পয়সায়ই বউ দেখা 'সারতে হলো। আহা-হা, আমি যদি পকেটে করে আমার তৃতীয় শ্রেণীর জন্য লেখা দুলালের ব্যাকরণ ও রচনা বইখানাও নিয়ে আসতাম !

ভদ্রমহিলা কম্বুকণ্ঠে বললেন : কাকে চান ?

সত্য কথা বলতে কি একজন ভদ্রমহিলাকে এমন একটা সংবাদ দিতে আমার বাধছিলো। কিন্তু পূর্বকথা স্মরণ করা মাত্র আমার

মনোভাবের পরিবর্তন ঘটলো। স্থানোপযোগী মুখভাব করে বললাম ঃ দেখুন, এই বাসায় স্তম্ভাশোক বলে কেউ থাকেন ?

নির্ঝরিণী বাধা দিয়ে বললেন ঃ স্তম্ভাশোক নয়, অশোকস্তম্ভ। থাকতেন নয়, বহাল তবিয়তেই আছেন। বাড়ীওয়ালার এক পয়সা ভাড়া বাকী নেই যে আমাদের উঠিয়ে দেয়। বরং আমরাই বাড়ীওয়ালাকে বাড়ীছাড়া করেছি।

ও, তাহলে আমি—গোরাচাঁদ গড়গড়ীকেই শুধু নয়, স্বয়ং বাড়ীওয়ালা মশাইকে পর্যন্ত বাড়ীছাড়া করেছেন। কে জানে রাজস্থান না দক্ষিণ কোলকাতা, কোথায় নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন।

—দেখুন, ইয়ে—কিছু মনে করবেন না। বাড়ীওয়ালাকে কীভাবে তাড়ালেন ?

আমি ধানকাটার সময় এই শিবের গীত না গেয়ে পারলাম না। আমার বাড়ীওয়ালা ভূমিকাভূষণ বাবু অতীব সজ্জন ব্যক্তি। তাঁকে বাড়ী ছাড়া করার কোন সদিচ্ছাই আমার নেই। এমনিতেই তিনি তাঁর দোকানে বাড়ী ছাড়া অবস্থায় সারাদিন থাকেন। দোকানে গেলেই চা এনে খাওয়ান। দোকানের বাকী টাকা মিটাতে গেলে দু-কাপ চা-ই খাওয়ান। দেখাদেখি পাশের সমাপ্তিসূচক দত্ত মশাইদের দোকানে তিন কাপ করে চা খাওয়ান সুরু করেছে। তা করুক, তবু আমি আমার বাড়ীওয়ালা ভূমিকাভূষণ বাবুকে বাড়ীছাড়া করার কথা ভাবিনি। তবে প্রক্রিয়াটা জেনে রাখা ভালো বলেই মনে হলো আমার।

—কী করে আবার, রেডিওর গান শুনিয়ে ! হিমালয় নির্ঝরিণী উপেক্ষা ভরে বলেন।

—গান শুনিয়ে ! কী সে-গান ! যা gun হয়ে বাড়ীওয়ালাকে ঘায়েল করলো ?

বাড়ীওয়ালারা এত সহজে ঘায়েল হন বলে আমার ধারণা ছিলো না ! অধিকাংশ বাড়ীওয়ালাই শুনেছি ঘুঘু পাখী। কিন্তু সে সব বাস্তুঘুঘুদের কি বন্দুক দিয়ে ঘায়েল করা যায় !

শ্রীমতী হিমালয় গর্বিত শৃঙ্গ নেড়ে বলেন : খেয়াল গান শুনিয়ে। দিন রাত্তির প্রোগ্রাম দেখে দেখে এ সেণ্টার সে সেণ্টারের খেয়াল গান শুনিয়ে। কিন্তু, কিন্তু, আপনি কে বলুন তো, দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে বেশ গল্প করে নিচ্ছেন? আপনি কি চানাচুরওয়ালা? অশোক কি পাঠিয়েছে আপনাকে? আর সে বুঝি অন্য কোথাও আড্ডা মারতে গেছে অ্যাঁ! এই পুরুষজাতটার মতো আড্ডাবাজ জাত আমি কোথাও দেখিনি, বুঝলেন চানাচুরওয়ালা মানে বুঝেছো চানাচুব-আলা!

দেখেচো ব্যাভারটা! আমি কিনা চানাচুরওয়ালা! এরপর আর ভালোমানুষীর দরকার কি আমার! ছিদ্র যখন পাওযা গেছে, ছোবল দিতে দোষ কী আমার! বিশেষ করে বাড়ীওয়ালাকে বাড়ীছাড়া করার ফিকির শোনার পর। এবার ফকীর সাজাতে দোষ কি আমার! মানে ফকিরিণী সাজাতে! কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব মর্যাদা ফুটিয়ে বললাম, দেখুন আমি চানাচুরওয়ালা নই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমেরিকাতে প্রতি তিনজন অধিবাসী পিছু একটা করে মোটরগাড়ী আছে?

—তা হবে। কিন্তু আপনি কী মোটরগাড়ীর এজেণ্ট? খুব ভালোকথা, আমরা যখন মোটর কিনবো তখন আপনার খোঁজ করবো। অবশ্য মোটর গাড়ীর এজেণ্ট আর ইনসিউর কোম্পানীর এজেণ্ট দুই-ই আমি দুচোখে দেখতে পারিনে। তবু প্রস্তাবটা খুবই ভালো। ভালো কথাই এটা।

—না, মোটেই ভালো কথা নয় এটা। আর আমি মোটব গাড়ীর এজেণ্টও নই। আমি বলতে চাইছিলাম আমেরিকায় মোটব গাড়ীর সংখ্যা বেশী বলে দুর্ঘটনাও বেশী। আমাদের দেশে যদিও প্রতি পাঁচহাজার লোক পিছু একটা করে মোটরগাড়ী আছে, তবু এদেশেও প্রতিবছর গড়ে সাতশ' সাতানব্বুই জন লোক গাড়ী চাপা পড়ে।

আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট থেকে ক্রমশঃ কংক্রিট্ এর দিকে এগুই। ধীরে ধীরে এগুই।

কিন্তু আমার বক্তব্য নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি বলেন : আহা মোটর গাড়ী চেপে কাউকে চাপা দিতে, পথচারীর ফর্সা কাপড়জামায় কাদা ছিটোতে যে কী থ্রীল তা আপনি কি করে বুঝবেন! এমন কি, বুঝলেন চানাচুরওয়ালা, না মোটর কোম্পানীর এজেন্ট, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, ঠাকুর চাকর ফিরিওয়ালাদের তো বৌঝিরা লজ্জা করার মত মানুষ বলে গণ্যই করে না, এই বাংলাদেশে কতজন যে শুধু মোটর গাড়ী চাপা পড়ে অদৃষ্ট ঘুরিয়ে নেয় তা কি বলবো! এমন কি চাপাপড়া লোকের সঙ্গে চাপা দেওনেওয়ালা লোকের মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত হয়ে যায়। অবশ্য যদি চাপাপড়ার পরও বেঁচে থাকে।

—আজ্ঞে, ইয়ে—সেজন্যেই কিনা কে বলবে, এই বাড়ীর এক ভদ্রলোক স্তম্ভাশোক নাকি কী নাম কিছুক্ষণ আগে মোটর চাপা পড়েছেন। অবশ্য চাপা দেনেওয়ালার কোন মেয়ে আছে কিনা আমরা জানিনে, কারণ চাপা দিয়ে তিনি পালিয়েছেন।

আমি স্থানোপযোগী কণ্ঠে সভাপতি মশায়ের নির্দেশ অনুসারে আমার বক্তব্য পেশ করি।

পরমুহূর্তেই, অ্যাঁ কোথায়? ওগো আমার কী হবে গো। আমি যে তাকে চানাচুর আনতে বাড়ীছাড়া করেছিলুম গো। বাড়ীওয়ালার অভিসম্পাতেই আমার বুঝি এমন হলো গো! আমি থাকতে তুমি কেন বিয়ে করার জন্যে চাপা পড়তে গেলে গো!

একমুহূর্ত পূর্বেও যিনি কাল্পনিক মোটরগাড়ী চেপে কাউকে চাপা দেবার থ্রীল অনুভব করছিলেন, সেই হিমালয় নির্ঝরিণী এক মুহূর্তে নির্ঝরিণীর মতো শতধা হয়ে ভেঙ্গে পড়লেন। এক মুহূর্তেই সত্যিকারের মেয়েছেলেই হয়ে পড়লেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জ্ঞানহীন অশোকচন্দ্রকে, না অশোকস্তম্ভকে জ্ঞানহীন অবস্থায় বয়ে নিয়ে কতিপয় বলিষ্ঠ সদস্য প্রবেশ করলেন।

—ওগো আমার কী হবে গো!

হিমালয় নির্ঝরিণী এবার সহস্রধা হয়ে পড়েন। এদিকে কাণ্ডজ্ঞানহীনা হিমালয়ের পাদদেশে, জ্ঞানহীন অশোকস্তম্ভকে, না অশোকস্তম্ভকে জ্ঞানহীন অবস্থায় শয্যার উপর শুইয়ে দেওয়া হয়।

বহনকারীদের মধ্যে একজন বলেন : দেখুন, মিসেস ইয়ে, আপনি অমন করে কাঁদবেন না। তেমন কিছু হলে, সারা জীবনই তো কাঁদার সুযোগ পাবেন। এখন কাঁদলে, রোগীও কেঁদে উঠতে পারে। সেটা আমাদের পরিকল্পনা, মানে রোগীর পরিণামের পক্ষে খারাপ হতে পারে।

বহনকারীদের মধ্যে দ্বিতীয়জন বললেন : আপনাদের পারিবারিক ডাক্তার কেউ আছেন কি ? ঠিকানা দিলে আমি বরং ডেকে আনি।

হিমালয় বাষ্পাকুল কণ্ঠে মাথা নাড়েন। অর্থাৎ এখনও তাদের পারিবারিক ডাক্তার হয়নি। কারণ মাত্র এই কয়মাসের মধ্যে চাঁদের আলো আর দখিনা বাতাস খাওয়ায়, এখনও ঐ তাগড়াই চেহারা দুটোর একটাকেও কোন অসুখ বিসুখ কাৎ করতে পারে নি। দুই নম্বর বহনকারী বললেন : হুঁ, ঠিক আছে। দেখুন তিন নম্বর বহনকারী মশাই, আপনি শিগগির আমাদের ক্লাবের, আই মীন্, ক্লাবরোডের সিদ্ধান্তকুমার সারেঙ এম. বি. বি. এস (হনললু) কে একটা কল্ দিয়ে আসুন তো ভাই। সঙ্গে করেই নিয়ে আসবেন। দেখুন মিসেস ইয়ে, তাহলে পাঁচটা টাকা অনুগ্রহ করে দিন তো, মিষ্টি মানে ট্যাক্সি ভাড়াটা মিটিয়ে দিতে হবে।

হিমালয় নির্ঝরিণী আকুল ভাবে পাঁচ টাকা বের করে বলেন : পাঁচ কেন, পাঁচশো টাকাও আমি এক্ষুনি দিয়ে দেব (এই সময় রোগীর অবস্থাটা একটু খারাপের দিকে গিয়েছিলো, একটা শারীরিক অস্বস্তি যেন ফুটে বেরুচ্ছিলো)।

সেদিকে তাকিয়ে আরও আকুল কণ্ঠে হিমালয় বলেছিলেন : আমি হাজার টাকা দেব, আপনারা আমার স্বামীকে ভাল করে দিন। আমার ঐ একটি বই স্বামী নেই। আপনাদের উপকার আমরা চিরকাল মনে রাখবো।

এ সময়ে রোগীর অবস্থা আরও খারাপের দিকে গিয়েছিলো। বেশ একটা বৈক্লব্যের মধ্য দিয়ে যে তিনি চলচেন, এটা ডাক্তার না হয়েও বুঝতে পারলাম।

চতুর্থ বহনকারী বললেন ঃ ডাক্তার না আসা পর্যন্ত আমাদের তো অপেক্ষা করতেই হবে! এই ফাঁকে একটু চা জলখাবার খেয়ে নিলে মন্দ হতোনা মনে হয়। তেমন তেমন ঘটলে আরও কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে! আর মোটর-চাপা-পড়া লোকদের মধ্যে তো শতকরা নিরানব্বুই জনই তেমন তেমন হয়ে থাকে। উপকার করার যে কত ঝামেলা, তা কি সবাই জানে!

আমাদের চা জলখাবার খাওয়া শেষ হতে না হতেই, আমার বিস্মিত দৃষ্টির সমুখ দিয়ে ডাক্তার সারেঙ এম. বি., বি. এস (হনললু) ওরফে পুলিশের এ. এস. আই জগন্নাথ সিং প্রবেশ করলেন। ভগবান জানেন, তাঁর কামস্কাটকারও কোন ডাক্তারী ডিগ্রী নেই।

তিনি ঘরে ঢুকেই অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতো সবাইকে ঘর থেকে সরিয়ে দিলেন। আমাকে বাড়ীর কেউ ধরে নিয়েই সম্ভবত সরিয়ে দিলেন না। তারপর গম্ভীর ভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা করে ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে বললে, হুঁ, বহুত্ খুব চোট্ লাগিয়েসে। আন্টিবাইলাকুইলুঙ্গুলার টিউবটি একেবারে জোখম হয়েছে আর কি? অবশ্য বাইরে থেকে ও-জোখম দেখা যায় না। আমি এখুনি একটা অ্যালোপ্যাথি দাওয়াই দিচ্ছি, চোড় চোড় করে জ্ঞান ভি হোয়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গেই অশোকস্তম্ভের জ্ঞান ফিরে এসেছিলো। না, দাওয়াই দেবার আগেই। দাওয়াই এর কথা শুনেই বলতে গেলে। চোখ মেলে একবার চাইলো অশোকস্তম্ভ।

আমার এবং শ্রীমতী হিমালয়ের ডাক্তারের উপর ভক্তি বেড়ে গেলো। সাধারণভাবে দেখা যায়, গেঁয়ো যোগীর চেয়ে ভিন্ দেশী

যোগীরা ভিক্ষে বেশী পায়। এ পাড়ার ডাক্তারেরা অন্য পাড়ায় গেলে ফী বেশী পেয়ে থাকেন। বিলাতের মডেলরা এদেশে এসে অনেক সময় রাজবধূর সম্মান পায়। ওয়েট্রেস্, সেলস্ গার্লরাও পায়। রাজা না জুটুক একহাজারী, দুহাজারী মনসবদার জুটতে দেরী হয় না। বিদেশী যোগিনী বলেই ভিক্ষুক করে ছেড়ে দেয়, তহবিলদারদের। আমাদের বন্ধু হংসমিথুনকুমার তহবিলদারকেই দিয়েছে।

সুতরাং ভিন্‌দেশী যোগী এ. এস. আই ডাক্তার (?) তাই প্রথম দৃষ্টিতে শ্রীমতী হিমালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

হিমালয় নির্ঝরিণী স্তম্ভের কাছে আরও এগিয়ে এলেন। সেদিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জড়িত কণ্ঠে বললো অশোকস্তম্ভ : নিয়ে এসো, নিয়ে এসো শীগগির।

হিমালয় বিন্ধ্যপর্বতের মতো মাথা নিচু করে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বললেন : এই যে আমি তোমার হিমলু, কী বলচো গো প্রাণনাথ !

ইতিহাসের মজাই এই—তার পুনরাবৃত্তি ঘটে। পুরানো গয়নার প্যাটার্নের মতো, পুরানো সম্বোধনগুলোও নতুন করে দেখা দেয়। কিন্তু আর প্রাণনাথ ! অশোকস্তম্ভ ততোধিক বিহ্বল কণ্ঠে বললো : অ্যাঁ, কে তুমি, কুমকুম সুবেশা, এসো ডারলিং প্রাণাধিকে !

—ওগো, আমার কী হবে গো। এ যে হামকো চিনতে পারতা নেহি হ্যায় ডাক্তারবাবু !

আর ডাক্তারবাবু ! অশোকস্তম্ভের নাড়ী টিপে ধরে রোরুদ্যমানা ভুল হিন্দিভাষিণী নারীর দিকে তাকিয়ে বললেন : কুছু বোয় পাবেন, না, হাঁ। মেণ্টাল হোরাইজেণ্টাল বার ডিস্‌ব্যালেন্সড্ হোলে এ রকমটা হোয়ে থাকে।

অশোকস্তম্ভ আবার বললো : নিয়ে এসো !

ডাক্তারবাবু জগন্নাথ সিং বললেন : কীই লিয়ে আসবে, অশোকস্তম্ভ ভাই !

—দাবা ! দাবা নিয়ে এসো। এক চালে গোরাচাঁদ, থুড়ি ট্যারা-চাঁদকে ঘায়েল করে দি।

দেখেছ কাণ্ড ! এইযে চিৎপটাং হয়ে, হরাইজেণ্টাল বার ডিস্-ব্যালেন্সড্ হয়ে পড়ে আছে তবু মুখের পটপটি যায়নি ! আমাকে বলে কিনা ট্যারাচাঁদ ! আমার দিদিমা আটীগ্রামের শ্রীমতী উন্মাদিনী দাস্যা জীবিতা থাকলে দেখিয়ে দিতো মজা। একবার আমার এক মামা আমাকে ঘোড়াচাঁদ বলে ডেকেছিলেন বলে দিদিমা তিন দিন খান নি। অবশেষে সেই মামা আমাকে কত আদর করে গুড় গুড় চাঁদ, গুরুং গুরুং চাঁদ বলার পর তাঁর মুখে হাসি ফুটেছিলো।

অবশ্য পরমুহূর্তে আমার মুখেও হাসি ফুটেছিলো। শ্রীমতী হিমালয়কে লক্ষ্য করে, স্তম্ভটা যখন বললো : তুমি আবার কোত্থেকে ঝপাৎ করে পড়লে মাইরি ! শ্যাওড়া গাছ থেকে ! ভো শূর্পণখা তফাত যাও। আমি ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলী। ওসব শাখচুন্নী আমার কিছু করতে পারবে না, হ্যাঁ।

হিমালয় নির্ঝরিণী ডাক্তারবাবুর হাত ধরে আবার কেঁদে পড়লেন। বোঝ ঠ্যালা এবার ! আমার আরও কান লাল করো। ইনস্যুরেন্সের এজেণ্ট বলো !

জগন্নাথ ডাক্তার এ. এস. আই বলেন : হুঁ, বুঝিয়াসে, হাপনাকে 'এলার্জি' ভাবতেসে। কোনহু কারণে হাপনাকে সহিতে পারছে না। হুঁ। আচ্ছা, মিসেস, হাপনি কি উহাকে খুব হাতের মুঠোয় রাখতেন মানে, ওকি হাপনাকে খুব বোয় করতো !

অন্য সময় হলে হিমালয়ে বিস্ফোরণ ঘটতো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইস্তিরী মাত্রেই স্বামীদের বিপদে একেবারে কাদা হয়ে যায়। কেঁদে কেঁদেই কাদা হয়। পাছে বেফাঁস কিছু বললে অশোকস্তম্ভের ক্ষতি হয় তাই ভয়ে ভয়ে বললেন : তা ইয়ে, মানে আমাকে একটু ইয়ে আর কি……।

ডাক্তারবাবু ঐ ইয়ার্কি থেকেই যেন সব বুঝতে পারেন।

—ও, বুঝিয়াসে। সেই থেকেই একটা মেণ্টাল ডাম্বেলের সৃষ্টি হয়েছে। ঐটাকে তুলতে হোবে।

—ডাম্বেল তুলতে হবে ডাক্তার সারেঙ! যেমন করে নোঙর তোলে! তা ডাম্বেল কি বুক দিয়ে তুলতে হবে, না বুকের ডাম্বেল তুলতে হবে ডাক্তার জগ—মানে সারেঙ! ডাক্তার সারেঙ ওরফে জগন্নাথ সিং এ. এস. আই ধমকের সুরে বললেন: সে হাপনারা কুছ বুঝবেন না। হামি দাবাই দিয়ে তুলে দেবে। আমি সিরিঞ্জও লিয়ে এসেচে।

তা নিয়ে এসেচেন ডাক্তার সারেঙ। স্যালাইন ইন্‌জেক্‌শন দেবার ইয়া বড় সিরিঞ্জ। না হোক করে পঁচিশ সি. সি.। আর সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই অশোকস্তম্ভ বলে উঠলো: তবে রে, এসো তোমায় আমি পুতনা করে ছাড়বো।

অশোকস্তম্ভ পুতনা বলতে কাকে বুঝিয়েছিলো আমি বুঝিনি। জগন্নাথ সিংকে কংস বলা যেতে পারে অবশ্য। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ মাত্রেই জানে, স্বপ্নে যা দেখা যায় তা কোন কিছুর প্রতীক। যেমন সাপের স্বপ্ন দেখলে বলা হয়ে থাকে সন্তানলাভ ঘটার সম্ভাবনা। কে জানে জগন্নাথ সিং পুতনা বা দাবা শব্দের মধ্যে কীভাবে প্রতীক দর্শন করলেন। চিন্তিত মুখে বলেন: হুঁ, বুঝিয়াসে। আচ্ছা মিসেস্, উনি কি কোন ক্লাবে ট্‌লাবে যেটেন?

হিমালয় নির্ঝরিণী অবাক বিস্ময়ে বললেন: আজ্ঞে হ্যাঁ, আগে যেতেন। মানে বিয়ের আগে যেতেন। বিয়ের পরও যেতে চাইতেন, কিন্তু আমি যেতে দেইনি ঐসব বাজে আড্ডায়।

দেখেছো কাণ্ড! এত ভেঙেও একবার মচকায় না। ইস্তিরী মাত্রেই কি স্বামীদের ক্লাবকে সতীন বলে মনে করে নাকি, অ্যাঁ!

ডাক্তার সিদ্ধান্তকুমার সিদ্ধান্ত করলেন: হুঁ, ঐ হয়েছে!

—আজ্ঞে কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?

—মানে করোনারী প্যালপিটিশন। একটা তিনশো তেইশ ধারা আই মীন্ একটা তিনশ তেইশ বাই চারশো সাতচল্লিশ নম্বর

ইনজেকশন দিলেই চলবে। আর দেখুন মিসেস নির্ঝ'ড়িনি, ওকে ভালো যদি করতে চান, তবে ওকে বেশ কিছুদিন ন্যাচারাল ট্রিটমেণ্ট কোরতে হোবে। বেশ কিছুদিন ওর খেয়ালই মেনে লিতে হোবে। তাকি হাপনি রাজী আছেন? অবশ্য মাঝে মাঝে হামি এসে দেখবে।

জগন্নাথ সিংজীর উপর হিমালয়ের ভক্তি ক্রমশই বেড়ে চলছিলো। এখন তারই তত্ত্বাবধানে এমন রোগী রাখার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থকণ্ঠে বললেনঃ তাই হোবে ডাক্তার সাব্। আপনি উসকো ভালো করে দিন।

ডাক্তার জগন্নাথ আত্মপ্রসাদের অভিব্যক্তি স্বরূপ গোঁফে চুমকি কেটে বললেনঃ আমি ওষুধ দিয়ে গেলাম না। ওষুধ খাবারও দরকার হোবে না। শুধু হাপনি একটু 'ওয়াচ্' রাখবেন। তবে বেশী কাছাকাছি যাবেন না। আর ওর 'উইলের' আই মীন্ মরজির বিরুদ্ধে কছু কোরতে যাবেন না।

অশোকস্তম্ভ আর একবার গর্জন করে উঠে বললেঃ কই, কুমকুম সুবেশা ডারলিং, দাবা নিয়ে এসো।

হিমালয় নির্ঝ'রিণী ম্লান মুখে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারের ফী আনতে গেলেন। জগন্নাথ সেদিকে তাকিয়ে বললেনঃ না না প্রতি কেসে হামার দশ টাকা ঘুষের রেট, আই মীন হামি ভিজিটকে ঘুষই বোলে থাকে। হামাদের অফিসার-ইন্-চার্জ হোলে অবশ্য আরও বেশী লিতেন। তবে তাঁকেও কুছু ভাগ দিতে হোবে আর কি!

আমি গোরাচাঁদ গড়গড়ী সেকথা সমর্থন করে বলিঃ সে তে বটেই, সে তো বটেই। জয়জগড়ন্নাথ।

আমি অবশ্য ঈশ্বরের নামই করেছিলাম। ভালোয় ভালোয় এমন প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য স্বয়ং জগন্নাথের ভূমিকার জন্যই বটে।

কিন্তু অশোকস্তম্ভ আমাকে হাতের কাছে পেয়ে একটি রাম চিমটি কেটে ছিলো! জগন্নাথ সিং-এর নাম ফাঁস করার জন্য, না জগন্নাথকে পনেরোটি টাকা পাঠিযে দেবার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য, তা ব্যাখ্যা না করেই। ঐ সঙ্গে, 'ব্যাটা ঘোড়াচাঁদ তোমাকে আমি বোড়ে দিয়ে কাৎ করবো' বলে একবার চীৎকার করে উঠেছিলো।

বলা বাহুল্য, ঘোড়া বলতে সে নিশ্চয়ই দাবার ঘোড়াকেই মানে করেছিলো। আব চাঁদ শব্দটা তো আমরা প্রশংসার্থেই প্রয়োগ করে থাকি।

তারপর সেই পনেবো টাকা হেতড়ে, হাতুড়ে ডাক্তার সাবেঙকে নিয়ে আমরা মোটবে উঠি। হ্যাঁ, বলিষ্ঠ বহনকারীদের নিযেই উঠি আমরা।

এরপব থেকে অশোকস্তম্ভ প্রতিদিনই ক্লাবে আসে। আড্ডা দেয়, দাবা খেলে। ভুল খেললে মাথায গাট্টা খায। হ্যাঁ, ঐ আহত মাথায়ই। এবং তাতে ব্যথা পেযে চীৎকার পর্যন্ত কবে না।

হিমালয় নির্ঝরিণীর সঙ্গেও খেলে। চাঁদ উঠলে ছাদে যেযে বসে। হিমালয়ের কোলে মাথা রেখে অনেক অসামাজিক কথাও বলে। অসামাজিক ব্যবহাবও কবে। সে সব ব্যবহাবে হিমালয় কিছু মনেও করে না। মনে কবার ব্যাপারও নয় সেগুলো। ইস্তিবীদের কাছে বিচ্ছিরী ব্যাভাবও নয়। আর খালি যখন-তখন খেতে চায়। অথচ এত খেয়েও নাকি তাতে স্তম্ভের পেট ভরে না। কারও নাকি পেট ভরে না।

কেবলমাত্র হিমালয়ের আদর যত্ন যখন বেড়ে যায়, আত্মশাসন মানে আম খাইয়ে খাইয়ে যখন শাসনের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন দু-একবার উদভ্রান্তের মতো অশোকস্তম্ভ 'কুম্‌কুম্ সুবেশা' 'কুম্‌কুম্ সুবেশা' বলে চীৎকার করে ওঠে। আর দাবা খেলতে চায়।

শ্রীমতী হিমালয় আর আপত্তি করে না।

এর কদিন পরই গিরিগোবর্ধন পাণ্ডাকে তার অভূতপূর্ব পরিকল্পনার জন্য একটি পরিবার-পরিকল্পনার বই উপহার দেওয়া হয়েছিলো। অশোকস্তম্ভকেও তার ক্লাবের প্রতি আনুগত্য ও সুন্দর অভিনয়ের জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। মিথ্যা ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জন্য চিত্তবিমোহন দাস মশাইকে একটা পুরস্কার প্রদানের কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করা হয়েছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কায়দা নাকি তিনি তাঁর ইস্তিরী শ্রীমতী অনামিকা না তর্জনীদেবীর কাছে যত্ন করে শিখেছিলেন। ডাক্তার এ. এস. আই সিদ্ধান্ত জগন্নাথ উচ্চারিত অসুখের নামগুলো মেডিকেল বোর্ডে পাঠানো হয়েছে। শীঘ্রই তাঁদের দেশের নিয়ম মতো একটি ছয় বছরের কন্যাকে যখন বিয়ে করতে যাবেন, তার পণের টাকায় যদি কম পড়ে (অবশ্য তিনি যে রেটে ভিজিটের টাকা আদায় করছেন, তাতে কম পড়ার কথা নয়) তাহলে বাকীটা আমরা চাঁদা করে তুলে দেবো এ ঘোষণা করা হয়েছে।

ট্যাক্সি ভাড়ার পাঁচটা টাকা আমিই পেয়েছি। আমরা মাননীয় সদস্য হিমকল্যাণ গোঁসাইর ধার করে আনা গাড়ীতেই হিমালয় বিজয়ে গিয়েছিলাম।

আমাদের রক্তপাতহীন নিখুঁত ষড়যন্ত্রের সাফল্যের জন্য সেদিনের সভাপতি বাগুইআটীর নিখুঁতবরণ বাগুই মশায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

হিমালয় ও ক্লাবের সঙ্গে রফা করে অশোকস্তম্ভ দফারফার হাত থেকে বেঁচেছে। এখন তারা পরম সুখেই আছে।

এবং শীঘ্রই যে আমাদের ক্লাব থেকে নতুন বই মঞ্চস্থ করা হবে তাতে অশোকস্তম্ভকে নায়কের ভূমিকা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। ঐ সঙ্গে কুম্‌কুম্ সুবেশাকে তার বিপরীত ভূমিকায় নামার অনুমতি দিয়েছি। হ্যাঁ, কুম্‌কুম্ সুবেশাকে আমিই বিয়ে করেছি। তাঁর হৃদয়ে কোন চিড় ধরেছিলো বলে কোন স্বীকারোক্তি কুম্‌কুম্ সুবেশা করেন নি। বরং আমাকেই নাকি অনাদি অনন্তকাল ধরে কামনা

করে এসেচেন, এবং আমাকে না পেলে নাকি তাঁর এ নারী জন্ম ব্যর্থ হয়ে যেতো, একথাই বিয়ের দিন থেকে বলে আসচেন।

আমি আরো এক ডিগ্রী বাড়িয়ে বলেছিঃ আমাদের এই জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন ছিন্ন করার সাধ্য স্বয়ং বিধাতাপুরুষেরও নেই।

হ্যাঁ, বিমলসুগন্ধিও আসে। আমিই নিয়ে আসি। সাড়ে ন' টাকা শিশির বিমল-সুগন্ধিই কুম্‌কুম্ সুবেশা পছন্দ করেন। আমাদের মাননীয় সদস্য বিমলসুগন্ধি বাবু, তাঁর তিন নম্বর পত্নী হিসেবে একজন মদ্রকুমারীকেই সুযোগ দেবেন ভাবছেন। বাঙালী কুমারীর প্রতি তাঁর ভরসা কমে গেছে শুনেছি।

হ্যাঁ, আর এক কথা—ইস্তিরী মাত্রেই কী, আমি আজও বুঝতে পারিনি। না, কুম্‌কুম্ সুবেশাকে লাভ করার পরও নয়। তবে এ সম্পর্কে একজন অথরিটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, ইস্তিরীরা কেমন, না যার মন যেমন।

॥ মধু ॥